বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা,১৯০০–১৯৪৭

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর, ২০০১ খ্রিঃ

Dhaka University Library
401279

GIFT

401279

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

এস, এম, কামরুজ্জামান
এম.ফিল. রেজিঃ ১৩২/৯৬-৯৭ইং
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

401273

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা,১৯০০–১৯৪৭

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর, ২০০১ খ্রিঃ

401279

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

(ডঃ কে, এম, মোহসীন)
অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

গবেষক

(এস, এম, কামরুজ্জামান)
এম.ফিল. রেজিঃ ১৩২/৯৬-৯৭ইং
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা আমাদের প্রশাসনিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে পুলিশ ব্যবস্থার সামগ্রিক চালচিত্র আবশ্যক। পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি জান মালের নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি আইনের কার্যকারিতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে, পুলিশ রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচিত। অথচ বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার উপর তেমন কোন গবেষণা কর্ম হয় নি বললেই চলে। তাই জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে।

401279

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা যেহেতু রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ, তাই রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ও মৌলিক গবেষণার অনুপস্থিতিও বর্তমান গবেষণার বিষয়টিকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। এ গবেষণা কর্মের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা, ১৯০০-১৯৪৭ এর ওপর সার্বিক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। এ গবেষণার মাধ্যমে পুলিশ ব্যবস্থায় উদ্ভব-বিকাশ-ক্রমোন্নতি, পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক রূপরেখা, পুলিশের নিয়োগ-প্রশিক্ষণ, পুলিশের ভূমিকা-কার্যাবলী এবং জনগণের সাথে পুলিশের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। এ গবেষণায় সাধারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Methodology) ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাসে যেহেতু আবেগের কোন স্থান নেই, তাই প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা যথাযথভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য মৌলিক ও অন্যান্য অনেক সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন রেকর্ডপত্রের মধ্যে রয়েছে পুলিশ কমিশন রিপোর্ট (Police Commission Reports), পুলিশ কমিটি রিপোর্ট (Police Committee Reports), পুলিশ এ্যাক্ট এবং অর্ডিন্যান্স (Police Acts & Ordinances), সরকারি অপ্রকাশিত প্রসিডিংস (Unpublished Proceedings) সমূহ। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে পুলিশ সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস ব্যবহার করা হলেও বিভিন্ন সময় উৎস ও গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সংক্রান্ত নানা তথ্য Police Administration Reports থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর এসব Report পুলিশ বিভাগের দ্বারাই রচিত। ফলে পুলিশের নিজস্ব অপরাধের অনেক চিত্র অগোচরে রেখে দেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই এসব তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে। তারপরেও পুলিশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের জন্য এসব প্রতিবেদনের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ বিশেষ করে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নেই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু গ্রন্থ বাংলাদেশের পুলিশের আলোকে রচিত হয়েছে। A.B.M.G Kibria কর্তৃক রচিত Police Administration in Bangladesh গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি রয়েছে। বইটি ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও বইটির মূল বক্তব্য হচ্ছে পুলিশের নৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কিত। এ গ্রন্থটিতে পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা প্রায় সবই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব অবস্থা এখানে স্থান পায় নি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুলিশের নীতি কথা সম্পর্কিত বক্তব্যই গ্রন্থটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। এই বইটি পুলিশের Ethics Guide হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১৯৪৭ পূর্ব পুলিশের গঠন কাঠামো, নিয়োগ-প্রশিক্ষণ, পুলিশ- কার্যাবলী, পুলিশের সাথে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ ইত্যাদি গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত।

তবে, W. R Gourlay এর A Contribution Towards a History of the Police in Bengal গ্রন্থটি বাংলাদেশের পুলিশের ইতিহাসের জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ১৯১৬ সালে মুদ্রিত এই গ্রন্থটি মূলত পুলিশ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ওপর ভিত্তি করে রচিত। বইটিতে প্রাচীন যুগ, মুসলমান যুগ, কোম্পানীর আমল ও ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন পর্যন্ত বাংলাদেশের পুলিশের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু পুলিশের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুলিশের কার্যাবলী, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিষয়াদি গ্রন্থটিতে স্থান পায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ আমিন চৌধুরী রচিত একটি গ্রন্থ হচ্ছে-বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা। গ্রন্থটি বাংলাদেশের পুলিশের বিভিন্ন তথ্যাদি জানার জন্য উল্লেখযোগ্য। মৌর্যযুগ থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত পুলিশ ব্যবস্থাপনায় সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পুলিশের বিভিন্ন স্তরের পদস্থ কর্মকর্তাদের নাম, কার্য মেয়াদ, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সদস্যদের তালিকা, পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ইত্যাদি গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পুলিশের বিভিন্ন বিষয় যেমন-১৯০২ সালের পুলিশ কমিশনের সুপারিশ ও তার বাস্তবায়ন, পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, পুলিশের কার্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে কোন আমলযোগ্য আলোচনা গ্রন্থটিতে নেই। অথচ এসব পুলিশ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

The Police in British India 1861-1947 গ্রন্থটির রচয়িতা *A. Gupta*. এ বইটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে পুলিশ সম্পর্কিত একটি আকরগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা-The years of Consolidation (1861-1904).The Police Commission 1902/03 এবং The years of Challenge (1905-1911)।এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ হলেও যেহেতু বইটি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত, তাই বঙ্গীয় প্রদেশ ও তার পুলিশ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকক্রমে কিছু তথ্য আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান তথ্যাদি আলোচিত হলেও গ্রন্থটিতে আলাদাভাবে বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনুপস্থিত।

এছাড়া N. A. Razvi রচিত Our Police Heritage একটি মূল্যবান গ্রন্থ হলেও এটি মূলত পাকিস্তান আমলের পুলিশ ব্যবস্থার বিবর্তনকে কেন্দ্র করে লিখিত। গ্রন্থটি The Heritage, the Transition, Development এবং Crime and other feathers এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও এতে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের প্রাধান্য দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে পুলিশ ব্যবস্থাপনা বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়নি। তাই, সার্বিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা, ১৯০০-১৯৪৭ বিষয়ক গবেষণায় পুলিশ ব্যবস্থার কিছু কিছু অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে। এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সাল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারি দিকচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে ১৯০০ সাল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন হলেও ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আবার ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্ট ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তাই, ১৯০৫ বা ১৯০২ সাল বিবেচনায় রেখেই প্রারম্ভিক সময় হিসেবে ১৯০০ সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীকেও গবেষণা শিরোনামের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে পুলিশের পটভূমিকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে বাংলাদেশ বলতে ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। যদিও ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত অঞ্চল বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল না। মূলতঃ এটি ছিল বঙ্গের অংশ এবং ১৯০৫ সালে এটা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নাম ধারন করলেও ১৯১১ সালে আবার বঙ্গের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আসলে তৎকালিন পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বোঝানো হয়েছে। পুলিশ বলতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সরকারি আইন বলবৎ রাখতে ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট ৫ এর মাধ্যমে যে ফোর্স গঠন করা হয়েছিল, তাকে বুঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা, ১৯০০-১৯৪৭ বিষয়ক গবেষণা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।এখানে পুলিশের উদ্ভব এবং পর্যায়ক্রমে তা বিকাশের বিভিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে কীভাবে পুলিশ মুসলিম যুগ, ব্রিটিশ আমল তথা ওয়ারেন হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস বিশেষ করে রেগুলেশন

Dhaka University Institutional Repository

১৮০৮, বার্ডস কমিটি ১৮৩৮ এবং ১৮৬০ সালের পুলিশ কমিশনের মাধ্যমে পুলিশ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এরপরে ১৮৯০-৯১ সালের থীম কমিটি এবং সর্বোপরি ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিশ সংগঠন শিরোনামে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো ও পুলিশ জনবল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সাংগঠনিক অবকাঠামো, পুলিশের সাংগঠনিক রূপ এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ সুপারিশের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিয়মিত পুলিশের সাথে নদী পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, সি-আইডি সহ গ্রাম্য পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পুলিশ কমিশন ১৯০২ এর সুপারিশসমূহ এবং পরবর্তীকালে তা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমিশন সুপারিশের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গতি-অসঙ্গতি এবং যোজন-বিয়োজনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পুলিশের সার্বিক ভূমিকা বা পুলিশের কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। পুলিশ, অপরাধ, রাজনীতি ও সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কী ধরনের ছিল তা মুখ্য হয়ে ওঠেছে। এছাড়া পুলিশের সামগ্রিক কার্যাবলীকে মূল্যায়নের জন্য অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আসলে পুলিশের দায়িত্বের নির্দিষ্ট ছকের বাইরেও জনকল্যাণ মূলক দায়িত্ব পালন করতে হয় পুলিশকে—এ বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়েছে। আর পঞ্চম অধ্যায়ে সিভিল সোসাইটির সাথে পুলিশের সম্পর্ক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্ক কিংবা পুলিশ সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গ এখানে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা, ১৯০০-১৯৪৭ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীনের তত্ত্বাবধানে রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে ঋণী।

গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে আমাকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ করেছেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী এবং ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মিসেস হোসনে আরা মোতহার আমাকে এ কাজে উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন।

এ গবেষণা কর্মে আমাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরি ব্যবহার করতে হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি সমূহ। এসব লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণ মঞ্জুর এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বৃত্তি মঞ্জুর করা না হলে এ কাজ সম্পন্ন করা যেত না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরী কমিশনের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে কম্পিউটার কম্পোজ এর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য ব্রাইট কম্পিউটারের মোঃ সফিকুর রহমান-কে ধন্যবাদ জানাই।

এস, এম, কামরুজ্জামান

ইতিহাস বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০১ খ্রিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	i—vi
প্রথম অধ্যায়	
বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	১-২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
পুলিশ সংগঠন	২৫-৫০
তৃতীয় অধ্যায়	
নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	৫১-৭২
চতুর্থ অধ্যায়	
পুলিশের কার্যাবলী	৭৩-৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	
পুলিশ ও সিভিল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক	৯৭-১০৭
উপসংহার	১০৮-১১১
পরিশিষ্ট	১১২-১৩১
গ্রন্থপঞ্জী	১৩২-১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

১. সারণি-১ ঃ ১৯০৬ সালে কলকাতা পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও জনবল, ১৯০৬ সালে প্রস্তাবকৃত জনবল এবং ১৯১৫ সালে বরাদ্দকৃত জনবল, পৃঃ ৩০

২. সারণি-২ ঃ ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির থানার সংখ্যা, থানার গড় আয়তন ও জনসংখ্যা এবং পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত স্টাফদের খতিয়ান। পৃঃ ৩৪

৩. সারণি-৩ ঃ ১৯৪০ সালে সাব-অর্ডিনেট পুলিশের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিতদের পদ অনুযায়ী মোট সংখ্যা ও শতকরা হার। পৃঃ ৩৫

৪. সারণি-৪ ঃ ১৯২১ সালে নদী পুলিশে নিয়োজিত জনবল। পৃঃ ৩৮

৫. সারণি-৫ ঃ ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে রেলওয়ে পুলিশ বিভাগে অপরাধ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা সংখ্যা। পৃঃ ৪০

৬. সারণি-৬ ঃ ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে রেলওয়ে পুলিশ বিভাগে অপরাধ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা সংখ্যা। পৃঃ ৪১

৭. সারণি-৭ ঃ ১৯০৪ ও ১৯১৫-১৬ সালে বঙ্গ প্রদেশের বাজেটে বরাদ্দকৃত পুলিশ স্টাফ। পৃঃ ৬৩

৮. সারণি-৮ ঃ বিভিন্ন জেলায় ১৯১২, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, লুণ্ঠন ও সিঁদচুরির সংখ্যা। পৃঃ ৬৭

৯. সারণি-৯ ঃ ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কনস্টেবল পদে মোট নিয়োগ সংখ্যা, বাঙ্গালীদের নিয়োগ সংখ্যা ও বাঙ্গালীদের নিয়োগের শতকরা হার। পৃঃ ৬৮

১০. সারণি-১০ ঃ সাব-ইন্সপেক্টর, হেড-কনস্টেবল ও কনস্টেবল পদে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়োগের শতকরা হার। পৃঃ ৬৯

১১. সারণি-১১ ঃ সাব-ইন্সপেক্টর পদে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে মোট নিয়োগ সংখ্যা, সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগ সংখ্যা ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ সংখ্যা। পৃঃ ৭০

১২. সারণি-১২ ঃ কতিপয় জিলায় ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, দন্ডনীয় অপরাধ, ডাকাতি ও সিঁদচুরির সংখ্যা। পৃঃ ৮৬

১৩. সারণি-১৩ ঃ ১৯২০ ও ১৯২১ সালে কতিপয় জিলায় সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, সিঁদচুরি ও গরুচুরির খতিয়ান। পৃঃ ৯৪

১৪. সারণি-১৪ ঃ ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, সিঁদচুরি ও গরুচুরির খতিয়ান। পৃঃ ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুলিশের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিককালে একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন প্রয়োগ ও বজায় রাখার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর ওপর অর্পিত। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানসহ অপরাধীদের গ্রেফতার ও সংঘটিত অপরাধের তদন্ত রিপোর্ট তৈরীর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের। অবশ্য প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও পুলিশ ব্যবস্থা আধুনিককালের মত ছিল না। সময়ের বিবর্তনে রাষ্ট্র কাঠামোর যেমন উন্নয়ন ঘটেছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পুলিশ ব্যবস্থাও আধুনিক স্তরে উপনীত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ পুলিশের উদ্ভব

রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাচীনপর্ব থেকে দায়িত্বশীল রাজকর্মচারিরা প্রহরীর ভূমিকাসহ নাগরিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। রাজকর্মচারীদের এই দায়িত্ব ক্রমবিবর্তনের ধারায় নানা সংস্কার ও পরিকল্পনা পরিগ্রহ করে বর্তমানের পুলিশ ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে। আসলে 'Police' শব্দটি গ্রিক শব্দ Polis থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ একটি নাগরিক সংগঠন, যার দায়িত্ব হচ্ছে নগরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নির্ণয় ও তা দমন করা। গ্রিক শব্দ Politeia এর অর্থ হচ্ছে শাসনতন্ত্র বা Constitution এবং Polites অর্থ নাগরিক। আর ল্যাটিন শব্দ Politia শব্দের অর্থ হচ্ছে নীতি যা Police শব্দের উৎপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১] পুলিশ ব্যবস্থা কখন কোথায় সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে তা ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ ব্যাপার।

১. Nazir Ahmad Razvi, *Our Police Heritage*, p.1.

Dhaka University Institutional Repository

Encyclopaedia of Britanica থেকে জানা যায় যে, কয়েক সহস্র বছর পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলনে পুলিশ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। এই পুলিশ ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক পুলিশ। প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ ছিল সামরিক বা আধা সামরিক সংগঠন যা শাসকদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর ভূমিকায় বা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার দায়িত্বে বা যোদ্ধা হিসেবে নিয়োজিত থাকতো। এই পুলিশের দায়িত্ব ছিল সমাজে আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ রাখা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিধান বহাল রাখা।[২]

পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তবে, পুলিশ শব্দটি আঠারো শতকে ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়। সরকারিভাবে পুলিশ শব্দের প্রথম ব্যবহার হয় ১৭১৪ সালে স্কটল্যান্ডের কমিশনার অব পুলিশ পদে নিয়োগ দানের সময়। প্রথমদিকে এটি সাধুবাদ পায় নি, বরং পীড়নের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৩] তাই পুলিশ এ সময় জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। নিম্নে প্রসঙ্গক্রমে ইংল্যাণ্ড, রোম ও ফ্রান্সের প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ ব্যবস্থা উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল–

ইংল্যাণ্ড

আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে প্রথমে ব্রিটেনে। তবে সেখানেও প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশের কোন সংগঠিত রূপ ছিল না। স্যাক্সন সময়ে (Saxon Period) পুলিশের সঙ্গে জমি ভোগকারীদের গাঢ় সম্পর্ক ছিল। রাজার জমি ভোগকারী এই থেন(Thane) পুলিশ প্রজাদের অপরাধ দমনের দায়িত্ব পালন করতো। এরপরে টাইথিং (Tything) দের উপর এই দায়িত্ব পড়ে। প্রত্যেক প্রদেশে একজন Shire reeve যিনি স্থানীয় অফিসার হিসেবে থাকতেন এবং তিনি ছিলেন নির্বাচিত। তাঁর ওপর কাউন্টি বা প্রদেশের শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল।[৪]

---

২. *Encyclopaedia Britanica*, vol. 25, 1997, p. 958.
৩. Nazir Ahmad Razvi, *Op. cit. p.1.*
৪. W. R. Gourlay, *A Contribution towards a History of the Police in Bengal, p.1.*

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ১০৬৬ সালে নরম্যানরা ব্রিটেন বিজয়ের পর বিদেশী Baron দের মধ্যে জমি পুনঃবন্টন করা হয়। নরম্যানদের বিজয়ের পূর্বে ইংল্যাণ্ডে আইন-কানুন বজায় রাখার জন্য Frank pledge পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। তারপরে প্রথম এডওয়ার্ড (১২৮৫ খৃঃ) লন্ডন শহরের শান্তি রক্ষার্থে 'watch and ward' পদ্ধতি নামে একটি বিধি পাশ করেন।[৫] এই পদ্ধতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লন্ডন শহরকে চব্বিশটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন 'এলডারম্যান' কে দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশ্য তার অধীনে ছয়জন 'ওয়াচম্যান' রাখা হয়।

নানা ঘটনাচক্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর ১৬৬৬ সালে প্লেগ রোগের মহামারিতে দেশের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এই সময় ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে Trading Justice হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা তাদের পেশা সম্মানজনক হলেও তারা নিজেরা ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং ও পরে তার সৎ ভাই স্যার জন ফিল্ডিং Bow Street এ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরাই মূলত আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার প্রবর্তক।[৬] তারাই ম্যাজিস্ট্রেটদের অফিসে পদ্ধতিগত ও সততা আনায়ন করেন।

তাঁরা কনস্টেবলদের ভাল বেতন দিতেন এবং কনস্টেবলরা পেশাগতভাবে গোয়েন্দা কাজে জড়িত থাকত। এই কনস্টেবলদের বলা হত Bow Street Runners। আর প্রবর্তিত সংগঠিত পুলিশ "Bow Street Patrol" নামে পরিচিত ছিল। এরপরে শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলে এবং পার্লামেন্টে ১৮১২ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়। এইসব কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ বিধি রদ করা হয়। ১৮২৯ সালে রবার্ট পীল কর্তৃক শান্তি রক্ষার জন্য 'Act for Improving the Police in and near the Metroplis' পাশ হয়। এই আইনের দুটি প্রধান বিধি ছিল– দুইজন বিচারক নিয়োগ (পরে তাঁরা কমিশনার হিসেবে খ্যাত হন) যারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কেন্দ্রীয় পুলিশ অফিসের দায়িত্ব এবং বেতনভুক্ত কনস্টাবুলারি ফোর্সের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।[৭]

---

৫. Nazir Ahmad Razvi, *Op. cit, p. 2.*

৬. W. R Gourlay, *Op. cit. p. 3.*

৭. *Ibid, p. 4.*

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৯ সালে রবার্ট পীলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সংগঠিত পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কিত বিলটি পাশ হলে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ইংল্যান্ডের পুলিশ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে আরো অনেক বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে এবং পুলিশ বিভাগের সদস্যরা তাদের আচার-আচরণ ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

রোম

রোমে অগাষ্টাসের সময় (খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দ) পুলিশ একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে ছিল। কিন্তু অগাষ্টাসের উত্তরসূরীদের হাতে পুলিশ অচিরেই জুলুমের এক ভয়াবহ যন্ত্রে পরিণত হয়।[৮] রোম সাম্রাজ্যের পতনে সকল পুলিশ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। তবে, আবার শার্লেম্যান (৭৪২-৮১৪ খৃঃ) এর সুবাদে পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অনেকগুলি নিয়ম বা প্রবিধান পুনঃপ্রবর্তিত হয়। পুলিশ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত বিধি আবার ভেঙে পড়ে সাম্রাজ্যের নানামুখী অরাজকতার কারণে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল রেখে ক্রমে রোমেও আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ফ্রান্স

ফরাসি বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের পুলিশ ব্যবস্থা ইংল্যান্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই প্যারিস পুলিশ সৃষ্টি করেছিলেন যা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হত। ফলে এই পুলিশ ব্যবস্থা জনগণের নিকট অপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে ১৬৯৭ খ্রিঃ Act of Directory এর মাধ্যমে পুলিশ মন্ত্রনালয় সৃষ্টি করা হয় যা স্বাধীন অফিস হিসেবে থাকলেও ১৮৫২ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

---

৮. *Encyclopaedia Britinnica* vol. XXI, 1911, p p.(978-979).
৯. Nazir Ahmad Razvi, *Op. cit. p. 5.*

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন যুগের পুলিশ

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে কখন কীভাবে পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। প্রাচীনকালে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন গোত্র বা অঞ্চল বিভিন্ন রাজার অধীনে শাসিত হত। ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে ষোড়শ মহাজনপদের কথা জানা যায়। কালক্রমে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে এই জনপদগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই জনপদগুলির মধ্যে মগধ রাজ্যই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের এক অখণ্ড সাম্রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মনু সংহিতায় প্রাচীন হিন্দু শাসন ও আইন কানুন সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। চৌর্যবৃত্তি রোধ করার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয় মনু সংহিতায়। এতে ছোট খাট চুরির জন্য জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তি এবং বড় ধরনের চুরির জন্য হাত কাটার মত শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই সময় পুলিশ আইন ছিল রূঢ় ও স্বেচ্ছাচারী। এছাড়া রাজার অনেক গুপ্তচর থাকত। তারা বিভিন্ন চোর ও অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করে দোষীদের ফাঁদে আঁটকাতো। অবশেষে দোষীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হত।[১০] চৌর্যবৃত্তি দমন এবং ইহার প্রতিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবর্গ পুলিশী দায়িত্ব পালন করত বলে অনুমান করা যায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা বর্ণনায় গ্রিক লেখক এক শ্রেণীর কর্মচারীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক বলা হত। আর Strabo এই শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে পরিদর্শক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যে সব ঘটনা সচরাচর ঘটছে তার খবরদারির ভার থাকতো এদের ওপরে। এদের কাজ ছিল গোপনে রাজাকে খবরাখবর সরবরাহ করা। তাই সবচেয়ে যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে পরিদর্শকের কাজে নিয়োজিত করা হত।[১১] ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের আরো বিবরণ দিয়েছেন James. H. Gense।

---

১০. W.R. Gourlay. *Op. cit.* p.p (9-10). *quoted in Elphinstone's History of India.*

১১. *হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ শ্রীসুশান্ত কুমার চক্রবর্তী,* ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রাম তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি ছিল স্বায়ত্তশাসিত, প্রথমদিকে তত্ত্বাবধায়ক গ্রামবাসিদের দ্বারা মনোনীত হতেন এবং তিনি তাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তার ওপর ন্যায়-বিচার, বিবাদ-মীমাংসা, জরিমানা ধার্য ও বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।[১২] অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ছিল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাঁর দায়িত্বের কিছু অংশ ছিল বিচারকের ভূমিকার ন্যায়। মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তত্ত্বাবধায়কে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩২৪-৩০০ খ্রিস্ট পূর্ব) শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস জানা যায় তাঁর প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য কর্তৃক রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে গূঢ় পুরুষগণের নিয়োগ দানের পরামর্শ দেয়া আছে। এখানে গূঢ়পুরুষ বলতে গুপ্তচরকে বোঝানো হয়েছে। গুপ্তচরকে অকুশল অর্থাৎ চৌর্যাদি এবং অনুচিত কর্ম দেখামাত্র রাজা ও প্রধান অমাত্যকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।[১৩] অপরাধীর শাস্তির কঠোরতা এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অপরাধ কর্মের স্বীকৃতি আদায় এর নির্দেশ রয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ও রাজুক, স্থানিক, সমাহরাতিক্র সন্নিধাত্রি ইত্যাদি নামের কর্মচারিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অশোকের রাজত্বকালেও বিভিন্ন কর্মচারী ও তাদের দায়িত্বের বিবরণ ও নির্দেশাবলী পাওয়া যায় অশোক কর্তৃক পর্বতগাত্রে খোদিত শিলালিপি থেকে। তিনি রাজুক ও ধর্মমহামাত্রা নামক অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

অবশ্য প্রাচীন বাংলার গুপ্ত পূর্বযুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তবে, গুপ্তযুগের প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে গুপ্ত শাসনাধীনে বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে আমাদের।

---

১২. N. A. Razvi, *Op. cit.* p.7, *quoted in James, H. Gense : History of India, p. 30*

১৩. কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম, অনুবাদ ঃ ডঃ নানাবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ছিল ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল, বীথি ও গ্রাম। ভুক্তিকে আধুনিক কালের প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গুপ্ত যুগে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে তা পরবর্তী যুগে মন্ডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পালযুগে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। দস্যু ও চোরের হাত হতে রক্ষার জন্য দেয় কর আদায় করতো 'চৌরোদ্ধরণিক'। বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন 'মহাদন্ডনায়ক' বা 'ধর্মাধিকার'। কেন্দ্রীয় শাসনের পুলিশ বিভাগ ছিল এবং 'মহাপ্রতীহার' 'দাণ্ডিক', 'দাণ্ডপাথিক' ও 'দণ্ডশক্তি' এই বিভাগের কর্মচারী। মহাপ্রতীহার খুব সম্ভবত রাজপ্রাসাদের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 'খোল' নামক কর্মচারী খুব সম্ভব গুপ্তচর বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন[১৩.১]। পালদের যে শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো ছিল তা সম্ভবত চন্দ্র, বর্মন ও সেনরাজ্যেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীনযুগে পুলিশী দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল।

১.৩ মুসলিম আমলে পুলিশ

আরবদের সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রিঃ) এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে, আর মুসলিম শক্তির উত্থান হয় গজনীর সুলতানদের মাধ্যমে এবং বাংলায় মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন হয় বখতিয়ারের আমল (১২০৪ খ্রিঃ) থেকে। দিল্লীর সুলতানগণ সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক খলিফাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে। পুলিশ ব্যবস্থা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল।

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় নগরায়ন সম্প্রসারণের ফলে রাতে পাহারাদার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা থেকে পুলিশ বাহিনীর ভিত্তি গঠিত হয় যার নাম ছিল 'আল আহদাস (al-ehdas)। শূরতা নামে নগররক্ষী হিসেবে পরিচিত এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন সাহিব আল-শূরতা।[১৪] শূরতা বাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে ছিল অপরাধ তদন্ত, অপরাধমূলক তৎপরতা দমন, বাজার পরিদর্শন, ওজন ও পরিমাপ পরীক্ষা করা। পরবর্তীকালে উমাইয়া খলিফাগণ নগর জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অপরাধ দমনের জন্য শূরতা নামের এই প্রতিষ্ঠানকে বলবৎ রাখেন। উমাইয়া যুগে (৬৬১-৭৫০ খ্রিঃ) শূরতার প্রধান

১৩.১. মুহম্মদ আব্দুর রহীম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৯৯৫, পৃঃ (১২১-১২৪).

১৪. N. A. Razvi, *op. cit. p.12.*

Dhaka University Institutional Repository

'সাহিব-আল-শূরতা' এবং 'সাহিব-আল-আহদাস' এই দুইনামে অভিহিত হত। শূরতা বাহিনীর কাজ ছিল আধা সামরিক বাহিনীর মত। প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করত আবার যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব পালন করত। অর্থাৎ কিছু কিছু কাজ সরাসরিভাবে পুলিশী দায়িত্বের মতই ছিল।

আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) দিওয়ান আল শূরতা বিভাগের ব্যাপক প্রসার ঘটে। শূরতা বিভাগ এই সময় চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা ঃ (i) শূরতা (সাধারণ পুলিশ বাহিনী) (ii) মা'উনা (সামরিক পুলিশ বাহিনী) (iii) হারাস (প্রহরী পুলিশ বাহিনী) (iv) আহদাস (বিশেষ পুলিশ বাহিনী)। সাম্রাজ্যের কোন কোন প্রদেশের সাহিব-আল-শূরতা নিজেই প্রাদেশিক গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতেন।[১৫] উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে শূরতা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল– অপরাধীদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তি প্রদান করা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ করা। এই ধরনের কার্যাবলীকে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান যুগের পুলিশ বিভাগের কার্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শূরতা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগ প্রায় একই ধরনের প্রতিষ্ঠান। এ সময়ে 'দিওয়ান-আল-হিসবা' নামেও একটি বিভাগের কথা জানা যায়।[১৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে মুসলিম আমলে। দিল্লীর সুলতানগণ (১২০৬-১৫২৬ খৃঃ) প্রায় তিনশত বছরের অধিককাল রাজত্ব করেন। সুলতানগণ ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। সুলতানী আমলের শাসন রীতি-নীতি, সংগঠন ও কর্মধারা ছিল মূলতঃ মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। ডঃ হুসায়নীর মতে, মুঘল শাসন ব্যবস্থা ছিল ইসলামী ও ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রন।[১৭] মুঘলযুগে মূলতঃ শেরশাহই পুলিশ ব্যবস্থা আরম্ভ করেন যা পরবর্তীকালে উৎকর্ষ লাভ করে। মুঘল আমলের পুলিশ প্রশাসন কার্যক্রমকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- (ক) গ্রাম (খ) জিলা (গ) নগর পুলিশ।

---

১৫. মুহম্মদ আলী আসগর এবং অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃঃ ২৫৫।

১৬. [আব্বাসীয় যুগে আইন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে বহাল রাখার জন্য "দিওয়ান-আল-হিসবাহ" নামক একটি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন মুহতাসিব। তবে, এই বিভাগের কাজকে পুলিশ বিভাগের কাজের সাথে তুলনা করা চলে না। কেননা এই বিভাগের মৌলিক দায়িত্ব ছিল নৈতিক, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক। যদিও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এই বাহিনীর ভূমিকা ছিল।]

১৭. S.A.Q Husaini, *Administration under the Mughals*, p. 24

Dhaka University Institutional Repository

শেরশাহের আমলে মোকাদ্দমগণ বা গ্রাম্য প্রধানগণ চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করতো।[১৮] গ্রাম্য প্রধানদেরকে পঞ্চায়েত বলা হত। শেরশাহের সময় সাম্রাজ্যকে সরকার ও পরগনায় বিভক্ত করা হয়। মুঘল আমলে কয়েকটি পরগনা নিয়ে জিলা বা সরকার গঠিত করা হয়। আর এই সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাজস্ব কর্তৃপক্ষের এবং বিশেষভাবে ফৌজদারের ওপর। তবে, পঞ্চায়েত প্রথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সুলতানী ও মুঘল আমলে পুলিশ সংক্রান্ত কার্যকলাপে যারা জড়িত ছিলো তাদের পদবী ছিল কোতোয়াল, ফৌজদার, শিকদার, থানাদার এবং গ্রাম্য চৌকিদার। নিম্নে কোতোয়াল ও ফৌজদারের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল যার মাধ্যমে তাদের পুলিশী কার্যাবলী সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে।

কোতোয়াল

ভারতীয় উপমহাদেশে শহর—পুলিশ ষ্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিতদের এখনও সাধারনত কোতোয়াল বলা হয়।[১৯] সব ধরনের অপরাধ দমন করে নগর জীবনে স্বস্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কোতোয়ালের কাজ। সুলতানী আমলে প্রত্যেক শহরে কোতোয়াল নিয়োগ করা হত। রাতের বেলায় শহরের টহল কাজে এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার জন্য কোতোয়ালের বাহিনী নিয়োজিত থাকত। দিল্লীর কোতোয়াল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। প্রাদেশিক শহরের কোতোয়াল অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। ছোট শহরে কোতোয়ালের মূলরূপ ছিল শিকদার যার অল্প কিছু ম্যাজিস্ট্রেয়াল (Magisterial) ক্ষমতা ছিল।[২০] মুঘল আমলেও কোতোয়ালরা সুলতানী আমলের মত একই দায়িত্ব পালন করতো। আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়াল নামক পুলিশ অফিসারের ওপর।[২১] কোতোয়াল বাড়ী ও রাস্তাঘাটের

১৮. *N. A. Razvi, Op. cit. p. 17*
১৯. *Ibid*, p. 27.
২০. *Ibid*, p. 29.
২১. ডঃ মুহম্মদ আলী আসগর ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

একটি তালিকা প্রস্তুত করে শহরকে কোয়ার্টারে বিভক্ত করতেন, প্রতিদিনের আগন্তুক ও গমনকারিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতেন। এছাড়া চোরদের গ্রেফতার, চুরিকৃত মালামাল উদ্ধার, বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন পরিমাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে নজরদারি করাসহ নানাবিধ কল্যাণজনক দায়িত্ব পালন করতো কোতোয়াল।[২২] কোতোয়ালের উপর বর্ণিত দায়িত্ব অনেকাংশ পুলিশের কার্যাবলীর সাথে তুলনা করা চলে। কোতোয়ালকে বেশ কিছু কাজে আধুনিক যুগের পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তবে তাদের কার্যাবলী শহরের মধ্যে সীমিত ছিল।

ফৌজদার

ফৌজদার ছিল মূলতঃ সামরিক অফিসার। তারপরেও ফৌজদারের কর্তব্য ছিল পুলিশী দায়িত্ব পালন করা, অনিয়ম দূর করা, চাঁদাবাজি ও ডাকাতি ঠেকানো ইত্যাদি। ফৌজদারগণ নিয়োজিত হতেন প্রত্যেক সরকার বা জিলায়। প্রত্যেক ফৌজদারকে তার স্থানীয় পুলিশী কার্যাবলীর জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে দায়িত্ব বন্টন করা হত।[২৩] তবে ফৌজদারের অধীনে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল কিন্তু তার অধীনে ছিল বরকন্দাজ। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে কোন লোক ডাকাতের কবলে পতিত হলে ফৌজদারকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হত। আকবরের আমলেও অনুরূপ দায়িত্ব ছিল।[২৪] ফৌজদারকে সাহায্য করার জন্য আবার থানাদার (Station Officer) ছিল ক্ষুদ্র এলাকায় দায়িত্বে। ফৌজদারের কার্যাবলী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ফৌজদার সামরিক কর্মকর্তা হলেও তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশী কার্যাবলী সম্পাদন করতে হত।

প্রাক ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলায় দু'রকম পুলিশ ছিল ঃ (১) ফৌজদারি পুলিশ ও (২) জমিদারি পুলিশ।[২৫] ফৌজদারী পুলিশ আসলে জিলা বা নগর পুলিশ হিসেবে বিবেচিত হত।

---

২২. S.M. Edwardes & H.L.O. Garrett, *Mughal Rule in India*, p. 185
২৩. N. A. Razvi, *Op. cit.* p. 31
২৪. SM Edwards & H.L.O. Garrett *Op. cit.* p.185.
২৫. এ. এ. খান, *বাংলাদেশ পুলিশ ঃ বিধিমালা কানুনসমূহ*, পৃ ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ফৌজদারি পুলিশ কোতোয়ালের অধীনে ফৌজদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। জমিদারি পুলিশ ছিল তিনস্তর বিশিষ্ট যথা- গ্রামীণ পুলিশ, থানাদারি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় পুলিশ। গ্রামীণ পুলিশের মধ্যে ছিল চৌকিদার, দফাদার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত। আর থানাদারী পুলিশ গঠিত ছিল কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে। থানাতে অনেক নায়েক, পাইক থাকতো–থানাদারি সত্ত্বভুক্ত জমিজমা থেকে তাদের ভরণপোষণ দেয়া হত। তাদের নগদ অর্থও দেয়া হত। থানাদারি পুলিশ ছিল গ্রামীণ পুলিশের সাহায্যকারি পুলিশ। গ্রামীণ পুলিশের স্বাধীনতায় থানাদারি পুলিশ কখনও হস্তক্ষেপ করতো না।[২৬] আর কেন্দ্রীয় পুলিশের ভূমিকা ছিল আন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করা। এরা ছিল বেতনভোগী পুলিশ কর্মী।[২৭]

সুলতানী ও মুঘল আমলে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল, এই সব কর্মকর্তাদের পদবী আধুনিক পুলিশের মত ছিল না, তবে তাদের কার্যাবলী ছিল পুলিশী কার্যাবলীর মত। আহমেদ আমিন চৌধুরী তাঁর *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*গ্রন্থে পুলিশের পদবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে করেছেন।[২৮]

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ইকলিম (প্রদেশ)	মোহতাসিব
শিক (বিভাগ)	ফৌজদার
পরগণা (জেলা)	থানাদার
গ্রাম	পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে দিল্লী সালতানাতের পুলিশ প্রশাসন কাঠামো নিম্নরূপ ছিল ঃ

প্রশাসনিক কেন্দ্র	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ইকলিম (প্রদেশ)	ফৌজদার
শিকাহ (বিভাগ)	ফৌজদার
আবহা (জিলা)	কোতোয়াল
পরগণা (থানা)	দারোগা
মৌজা (ইউনিয়ন)	গ্রাম চৌকিদার

২৬. পঞ্চানন ঘোষাল, *পুলিশ কাহিনী*, পৃ. ৯২.

২৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৩.

২৮. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, পৃঃ (৩২-৪২).

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল আমলে কোতোয়ালের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ক্রমবিন্যাস ঃ

কোতোয়াল
দারোগা
জমাদার
হাবিলদার
নায়েক
সওয়ার ও বরকন্দাজ বাহিনী (কনস্টেবল)।

এছাড়াও আরো যারা কর্মকর্তা ছিলেন তারা হলেন–

হাবিলদার (প্রাসাদরক্ষী)

জানদার (দেহরক্ষী)

সিলাহদার (বর্মরক্ষী)

দফাদার (দশজন অশ্বারোহী বরকন্দাজের অধিনায়ক)

জল্লাদ (মৃত্যুদণ্ড কার্যকরণকারি)

মোঘল আমলে পুলিশ ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ

১. মফঃস্বল পুলিশ ব্যবস্থা ও
২. নগর পুলিশ ব্যবস্থা

নগর-পুলিশ কর্মকর্তা কোতোয়ালের অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ ছিল ঃ

১. দারোগা
২. জমাদার
৩. হাবিলদার (প্রাসাদরক্ষী)
৪. নায়ক
৫. জানদার (দেহরক্ষী)
৬. সিলাহদার (বর্মরক্ষী)
৭. জল্লাদ (মৃত্যুদণ্ড কার্যকরণকারী)
৮. পাইক/বরকন্দাজ (কনস্টেবল)
৯. পেয়াদা (পিয়ন)

Dhaka University Institutional Repository

ফৌজদারের অধীন থানার লোকবল

১. থানাদার
২. জমাদার
৩. দফাদার
৪. হাবিলদার
৫. নায়ক
৬. সওয়ার, বরকন্দাজ, পাইক
৭. পেয়াদা (পিয়ন)

ফৌজদারের মূল বাহিনী

অশ্বরোহী

১. সাহিব-ই-রিসালদার
২. নায়েব-ই-রিসালদার
৩. দফাদার
৪. লাঞ্চ দফাদার
৫. নিশান বরদার
৬. সওয়ার (অশ্বারোহী সৈনিক)

পদাতিক

১. লস্কর-ই-খেল
২. সর-ই-লস্কর
৩. সরই-পাইক
৪. সরই-গোলন্দাজ
৫. পাইক, বরকন্দাজ, লস্কর, গোলন্দাজ

মুঘল আমলের শুরু থেকে শাহজাহানের আমল পর্যন্ত (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ও মফস্বল এলাকার পুলিশ ব্যবস্থার একটি তালিকা এখানে প্রদান করা হল ঃ

প্রশাসনিক একক	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
সুবা (প্রদেশ)	কোতোয়াল-ই-সদর
সরকার (বিভাগ)	ফৌজদার
পরগণা (জিলা)	থানাদার
তহসিল (থানা)	জমাদার
মহাল (ইউনিয়ন)	গ্রাম্য চৌকিদার

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৫০–১৮০০) পর্যন্ত

প্রশাসনিক একক	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
সুবা (প্রদেশ)	কোতোয়াল-ই-সদর
সরকার (বিভাগ)	ফৌজদার
পরগণা (জেলা)	ফৌজদার ও প্রয়োজনীয় থানাদার
তহসিল (থানা)	থানাদার
মহাল (ইউনিয়ন)	গ্রাম্য চৌকিদার

১.৪ ব্রিটিশ আমলে পুলিশ

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরই নিজেদের স্বার্থে পুলিশ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটায়। প্রথমে কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির জমিদারী-স্বত্ব ক্রয়ের ফলে অত্র অঞ্চলে পুলিশ ও ফৌজদারি বিচারের বিষয়াদি কোম্পানীর ওপর বর্তায়। তখন অবশ্য কলকাতায় মুসলিম রীতি অনুযায়ী কোতোয়ালের অধীন পুলিশ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তবে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর বাংলায় নওয়াবের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সামরিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ও কোম্পানি লাভ করে।[২৮] দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে প্রকৃত শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়। তখন মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় কোর্ট কাছারি ছিল। ১৭৭২ সালে দু'ধরনের কোর্ট স্থাপন করা হয়। যথা- (ক) ফৌজদারি কোর্ট (খ) দেওয়ানী কোর্ট। কালেক্টরগণ উভয় কোর্টের উপর তদারকী করতেন।

২৮. W.R. Gourlay, *Op. cit.* p. 15.

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জনশান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন। সে উদ্দেশ্যে দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের উন্নতি করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই অপরাধ দমনে মুঘল ফৌজদার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং ফৌজদারকে হুগলি, কাটোয়া, নির্জানগর ও বোসনাতে পদায়ন করা হয় যাতে তারা জমিদারদের অধীন পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[২৯] কেননা এই সময় জমিদারগণের অধীন পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিল। তাই, ওয়ারেন হোষ্টিংস ১৭৭৪ সালে পুলিশ প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য গভর্ণরের কাউন্সিলে দাবী উথাপন করেন। এটাই ছিল কোম্পানীর পুলিশ সংগঠন প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ।[৩০] এই সময় ফৌজদারি ষ্টেশনের জন্য ১৪টি স্থানের নাম ঘোষণা করা হয়।[৩১]

১৭৭৫ সালে মোহাম্মদ রেজাখান নায়েব নাজিম হিসেবে নিযুক্তি পান এবং সারা দেশে (বাংলায়) ফৌজদারি কোর্ট ও অপরাধ বিচার সংক্রান্ত প্রশাসনিক কর্তৃত্বও লাভ করেন। তারপরেও পুলিশ জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি।

১.৫ লর্ড কর্নওয়ালিস ও থানাদারি পুলিশ

কোম্পানী কর্তৃক কার্যকরী পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যর্থ হলে দেশ এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির কবলে পড়ে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। ফালেষ্টরগণ এসব অব্যবস্থাজনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই লর্ড কর্নওয়ালিস একটি সংগঠিত ও নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার প্রচেষ্টায় ৭ ডিসেম্বর ১৭৯২ সালে গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলে

---

২৯. N. A. Razvi, *Op. cit. p.* 50.

৩০. W. R. Gourlay, *Op. cit. p.* 22.

৩১. ঘোষিত চৌদ্দটি স্থানের নাম ছিল- (১) কলকাতা, (২) তান্নাহ নেউয়া, (৩) হুগলি, (৪) কোটোয়া, (৫) ঝিল শেরপুর, (৬) মুর্শিদাবাদ, (৭) গোদাগাড়ি, (৮) শেরপুর, (৯) আতাই, (১০) রাজিনগর, (১১) বাকেরগঞ্জ, (১২) মির্জানগর, (১৩) ইচাখাদা, (১৪) বীরভূম।

Dhaka University Institutional Repository

"Regulations for the Police of the Collectorships in Bengal, Behar and Orissa" পাশ হয়। পরে ইহা রেগুলেশন XXII, ১৭৯৩ নামে রূপ লাভ করে।[৩২] এই রেগুলেশন অনুযায়ী জমিদার ও জমির মালিকগণ আর পুলিশ বাহিনী পোষণ করতে পারবে না। দারোগাদের তাদের ষ্টেশনে থাকার ব্যবস্থা করা হয় জুরিসডিকশন অনুযায়ী। দারোগা অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারতেন কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া। দারোগা অপরাধীদের গ্রেফতারের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীনে প্রেরণ করতেন।

জিলা জর্জ ১৭৭৪ সালে ফৌজদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ম্যাজেষ্ট্রেসীয় ক্ষমতাও ধারণ করেন। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের বাংলার জিলাসমূহের পুলিশ এখতিয়ারে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পুলিশ প্রশাসনকে চারশত বর্গমাইল সীমানা নিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়। আর প্রত্যেক প্রশাসন এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয় একজন দারোগার ওপর।

দারোগাদের বেতন সরকারি খাত হতে দেয়া হত। এই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা শহরকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয় ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে। আর প্রত্যেক ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন একজন দারোগা। দারোগাদের অবস্থান ছিল তার পরবর্তী কর্তৃপক্ষ কোতোয়ালের অধীন।[৩৩] শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অপরাধীকে গ্রেফতারের জন্য দারোগা ও কোতোয়ালের প্রয়োজন পড়তো। রাতের টহলের সময় গ্রেফতারকৃতদের অতি প্রত্যুষে কোতোয়ালের নিকট হাজির করা হত। আর কোতোয়াল এই অপরাধীদের সকাল ১১টার মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করতেন। একজন দারোগার অধীনে সীমানা অনুযায়ী ১০ থেকে ৪০ জনের একটি দল থাকতো এবং এই দলের অন্তর্ভুক্ত থাকতো প্রত্যক্ষদর্শী প্রহরী, লেখক, এক বা একাধিক জমাদার এবং কিছু বরকন্দাজ। অনুমতি ছাড়া দারোগাগণ প্রতিবেশী এলাকা থেকে অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারতেন।

---

৩২. W.R. Gourlay, *Op. cit. p. 29.*
৩৩. *Ibid.* p. 33.

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ রেগুলেশন ১০, ১৮০৮ এবং বার্ডস কমিটি-১৮৩৮

১৮০৮ সালে লর্ড মিন্টোর সুপারিশ অনুযায়ী রেগুলেশন X, ১৮০৮ এর মাধ্যমে জিলা পর্যায়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়।[৩৪] সুপারিনটেনডেন্টদের কাজ শহর ও শহরবর্তী এলাকায় সীমিত ছিল। তবে ১৮২৯ সালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং তার কার্যাবলী রাজস্ব ও সার্কিট কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আবার Act XXIV. 1837 দ্বারা সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ পুনর্বহাল করা হয়।[৩৫]

থানাদারি পুলিশ ব্যবস্থা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য লর্ড ময়রা পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধায়নের অভাব এবং পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতাকে দায়ী করেন। দারোগাদের বেতনের তুলনায় তাদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল বেশী। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত থানাদারি পুলিশ পদ্ধতির কর্মদক্ষতার ওপর গভর্ণর জেনারেল মাকুইস (লর্ড ময়রা, ১৮১৩-১৮২৩) একটি তদন্ত পরিচালনা করেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে একটি কার্য বিবরণী তৈরী করে সমস্যাদির বিশ্লেষণ করেন। ফলস্বরূপ পুলিশ সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক আইনকে একত্রিত করে রেগুলেশন XX. ১৮১৭ এর অধীনে এনে দারোগা ও অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার কার্যাবলীকে ৩৪টি উপধারাতে পুনর্বিন্যস্ত করা হয় যা ১৮৬১ সাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।[৩৬] এই সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮২৮ সালের দিকে পেশাদারি, সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী প্রবর্তনের জন্য রবার্ট পীল একটি বিল উপস্থাপন করেন। ইহা অনুমোদিত হয় ১৮২৯ সালে এবং শহর কেন্দ্রিক প্রথম আধুনিক পুলিশ সংগঠন হিসেবে ইহা ছিল আধা সামরিক বাহিনী।[৩৭]

---

৩৪. *Ibid.* p. 38.
৩৫. *Ibid.* p. 38.
৩৬. N. A. Razvi, *Op. cit. p.* 52.
৩৭. Elmer graper. *American Police Administration.* p.1.

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডন পুলিশের অগ্রগতিতে ও উন্নতিতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস দেশের পুলিশ প্রশাসনকে সংগঠিত করার জন্য মনোনিবেশ করে। বাংলাদেশেও পুলিশ ব্যবস্থা উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। স্যার চার্লস ম্যাটকফ কিছু প্রশ্ন সিরিজ তৈরী করেন যা সারা ভারতে সরবরাহ করা হয় এবং ১৮৩৮ সালে বার্ড এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য প্রাদেশিক পুলিশ সংগঠনের উন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্য পুলিশ সংগঠন গড়ে ওঠার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সারসংকলন করা। কমিটি কর্তৃক উদঘাটিত পুলিশের অদক্ষতার মধ্যে ছিল বিভিন্ন কমিশনারদের মধ্যে অসহযোগিতা ও অসমতামূলক আচরণ। এছাড়া ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের অভাব। একই জরিপে থানাদারি দুর্নীতি ও অদক্ষতাকে সনাক্ত করা হয়।

অতঃপর কমিটি নানা সংস্কারের কথা ব্যক্ত করে। কমিটি পুরাতন গ্রাম্য সমাজ পদ্ধতিকে সংস্কারের জন্য ও আবেদন রাখে। সেসাথে কমিটি চৌকিদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদানের সুপারিশ করে।

হলিডে ছিলেন বার্ড কমিটির একজন সদস্য। তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন নির্বাহী ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। তিনি বার্ড কমিটির সুপারিশের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। অতঃপর তিনি কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন যার মধ্যে ছিল—হেড কোয়ার্টারসমূহে একজন করে সুপারিনটেনডেন্ট জেনারেল অব পুলিশ, ২৩ জন স্থানীয় সুপারিনটেনডেন্ট, ৩২ জন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট, ৮৮৮ জন দারোগা, ৮৮৮ জন সাব-ইনসপেক্টর, ৪৪৪০ জন জমাদার, ৬,৬৬০০ বরকন্দাজ বরাদ্দের কথা বলেন। তবে হলিডে সুপারিশের মধ্যে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা এবং প্রতি জিলার একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নিয়োগদানের কথাও গৃহীত হয়।[৩৮]

---

৩৮. W.R. Gourlay, *Op. cit. p.* 61.

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ নতুন পুলিশ-১৮৬০ এবং পুলিশ এ্যাক্ট ৫, ১৮৬১

কোর্ট অব ডাইরেক্টস ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬ সালে বিচার বিভাগীয় এক ডেসপ্যাচে ভারতের প্রাক্তন প্রদেশ সমূহে পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সে আলোকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ (জুডিশিয়াল) একটি পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাব পাশ করে। এই কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন–

(১) Court— উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রতিনিধি
(২) Colonel phayre— পেগুর কমিশনার
(৩) Wauchope—বাংলার প্রতিনিধি
(৪) Robinson—মাদ্রাজ প্রতিনিধি
(৫) Temple— পাঞ্জাব প্রতিনিধি
(৬) Colonel Bruce— অযোধ্যার পুলিশ প্রতিনিধি।[৩৯]

সদস্যবর্গের সকলেই ছিলেন পুলিশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ। পুলিশ সংস্কার বিষয়টি পূর্বে অনুভূত হয়েছিল। তারপরে এ সময় নানাবিধ সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ফৌজদারি প্রশাসনও ছিল দারুন বিপর্যয়ের মধ্যে। আসলে যখন থেকে ইউরোপীয়রা এদেশে বসতি স্থাপন করে তখন থেকেই প্রশাসনিক সংস্কার জরুরি ছিল।[৪০] অবশ্য এই কমিশনের বহু পূর্ব হতে পুলিশ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল যদিও তা পূর্ণ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

১৮৫৮ সালে ব্রিটেনের মহারানীর ঘোষণার পর ভারতীয় উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থানীয় সীমান্ত রক্ষাসহ সার্বিক দায়িত্ব রানীর ওপর বর্তায়। ফলে ইউরোপীয় সৈন্যসহ যারা এদেশে অবস্থান করছিল তাদের এবং ভারতবাসীর জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা প্রদানের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে পুলিশ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৮৬০ সালে গঠিত পুলিশ কমিশন ১৮২১, ১৮৩২, ১৮৪৩, ১৮৪৯ সালের সকল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তা একটি খসড়া বিল আকারে আইন সভায় উথাপন করা হয়। অবশ্য এই খসড়া বিল ছিল The Madras Police Act XXIV, 1859 এর মডেল অনুযায়ী।

---

৩৯. *Ibid*, p. 71
৪০. A. Gupta, *The police in British India*, p. 5.

Dhaka University Institutional Repository

এতে বলা হয়–

(১) সিভিল নির্বাহী সরকারের তত্ত্বাবধানে পুলিশ ফোর্স থাকবে।

(২) পুলিশী দায়িত্ব সামরিক প্রকৃতির না হয়ে হবে সিভিল।

(৩) পুলিশের মুখ্য কাজ হবে প্রতিরক্ষামূলক ও দমনমূলক। অপরাধ নির্ধারন ও তদন্ত করা এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করা।

(৪) পুলিশ ফোর্স অবশ্যই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

(৫) মিলিটারি সংগঠনের মত সংগঠিত হতে হবে পুলিশকে।

(৬) পুলিশের নিয়োগ ও বরখাস্ত ইউরোপীয় অফিসারদের দ্বারা হতে হবে।

(৭) পুলিশকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পোষাকে সজ্জিত থাকতে হবে।[৪১]

পরিশেষে পুলিশ কমিশন ঐকমত্যের ভিত্তিতে পুলিশ কনস্টাবুলারি পদ্ধতির জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়–

ক. ব্রিটিশ ও আইরিশ কনস্টেবুলারি পদ্ধতি অনুযায়ী সিভিল রক্ষণাত্মক প্রকৃতির ফোর্স ভারতের যে কোন অংশে গঠন করা যাবে।

খ. পুলিশ ফোর্স সিভিল সংগঠন হবে যা কেবল সিভিল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। গ্রাম্য পুলিশ ও জমিদার বা গ্রাম্য সম্প্রদায় ও গ্রাম্য চৌকিদার এর সম্পর্ক সংরক্ষিত থাকবে। তাদের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত পরিচালনার ক্ষমতা অর্পিত হবে জিলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের ওপর।

গ. প্রত্যেক স্থানীয় সরকারের আলাদা পুলিশ প্রশাসন থাকবে।

ঘ. প্রত্যেক প্রদেশে একজন ইনসপেক্টর জেনারেল নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রাদেশিক পুলিশ ফোর্সের সার্বিক ব্যবস্থা পরিচালনা ও কাজের সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হবে। আর জিলা পর্যায়ে পুলিশী কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে একজন সুপারিনটেনডেন্টের ওপর। তবে, বড় জেলার ক্ষেত্রে একজন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট থাকবেন। অবশ্য উভয় কর্মকর্তা হবেন ইউরোপীয়।

---

৪১. W.R. Goulrlay, *Op. cit. pp.* (72-73).

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. আর পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে সম্পর্কে বলা হয় যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কার্যাবলী তদারকি করতে পারবেন এবং পুলিশ অফিসার কোন বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতে অনুমতি প্রাপ্ত হবেন না।

চ. ক্লার্ক, রাইটার্স ও মিনিস্ট্রীয়াল অফিস সংক্রান্ত কোন পৃথক কর্মচারী রাখা হবে না। পুলিশের অন্তর্ভুক্ত লোকদের দ্বারাই তা সম্পন্ন করতে হবে।[৪২] লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিলটি উত্থাপনের সময় Bartle Frere দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং বিদ্যমান পুলিশের অদক্ষতা, দুর্নীতি, দুর্বল তত্ত্বাবধায়নসহ নানা ত্রুটির কথা ব্যক্ত করে তার নিজস্ব মতামত পেশ করেন।

অবশেষে কমিশনের সুপারিশ মতে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কনস্টাবুলারি পদ্ধতির পুলিশ ফোর্স গঠনের জন্য লেঃ কর্ণেল ব্রুশকে অস্থায়ীভাবে ভারতের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে নিয়োগ করা হয়। নতুন পদ্ধতির পুলিশ প্রবর্তনের জন্য কর্ণেল ব্রুশ বঙ্গীয় প্রদেশের মফঃস্বল পুলিশ ও কলিকাতা পুলিশ সম্পর্কে দুটি প্রতিবেদন জমা দেন। অবশেষে সবকিছু বিবেচনা করে বিলের খসড়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত হলে ১৬ মার্চ ১৮৬১ সালে তা পাশ হয় এবং ২২ মার্চ থেকে এ্যাক্ট V, ১৮৬১ নামে আইনটির কার্যকারিতা শুরু হয়।[৪৩] এই আইন ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ ব্যবস্থা গঠনে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে। এই আইনের অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আইরিশ কনস্টাবুলারি পদ্ধতির পুলিশ ব্যবস্থা প্রথম শুরু হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীকে সুসংগঠিত করা হয় মূলতঃ ১৮৬০ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের আলোকে। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর ভিত্তি রচিত হয়।

---

৪২. *Ibid*, p. 76.

৪৩. A Gupta, *The Police in British India*, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ বীম কমিটি ১৮৯০-৯১

১৮৬১ সালের নতুন প্রবর্তিত পুলিশ ব্যবস্থায় কার্যাদি বাংলার প্রাদেশিক সরকার ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষা করতে থাকে। প্রথমদিকে নতুন পুলিশ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় সন্তোষজনক হলেও ক্রমান্বয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ ও অদক্ষ হয়ে ওঠে। পুলিশ ব্যবস্থার সার্বিক বিষয়াদি মূল্যায়নের জন্য বাংলার গভর্ণর ষ্টুয়ার্ট বেলি একটি কমিটি গঠন করেন। ভাগলপুরের কমিশনার জে. বীমের সভাপতিত্বে কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ছিলেন–

J. F. Stevens—গয়ার জিলা জর্জ, J. C. Veasy— পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, Raja Peary Mohan Mukherji এবং E. R. Macnagthen—বিহার প্লান্টার এসোসিয়েশনের সম্পাদক, এবং H. H Risley সদস্য ও সচিব হিসেবে ১৮৯০ সালে কমিটির কাজ শুরু করেন।[৪৪]

এই কমিটি নিয়মিত পুলিশ ও ফৌজদারি আদালত সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করে। সুপারিশে নব নিয়োগকৃতদের বিনামূল্যে পোষাকাদি সরবরাহ, হেড কনষ্টেবলদের সংখ্যা হ্রাস এবং সাধারণ পুলিশকে শিক্ষিত (literate) ও অশিক্ষিত (non-literate) শাখায় বিভক্ত করা হয়। শিক্ষিত শাখায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর এবং শিক্ষানবিশগণ। অপরদিকে non-literate শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় হেড কনষ্টেবল এবং কনষ্টেবলদের। এদের প্রতিরক্ষা সহচর, পাহারাদার ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক দায়িত্বে নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষিত শাখার সদস্যদের অপরাধ তদন্তমূলক কাজ ও প্রতিবেদন রচনা সংক্রান্ত কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাব ইন্সপেক্টরদের সরাসরি নিয়োগ দান এবং সাব ইন্সপেক্টরের নীচের পদের কাউকে পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে বা তদন্ত কাজে না রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

বঙ্গীয় সরকার ১৮৯১ সালে কমিটির সুপারিশসমূহকে বিবেচনায় এনে নিম্নোক্ত শিরোনামে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে— (i) গ্রাম্য পুলিশ (ii) নিয়মিত পুলিশ (iii) ফৌজদারি আদালত।

---

৪৪. W.R. Gourlay, *Op. cit.* 83

Dhaka University Institutional Repository

এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গ্রাম্য পুলিশ সংক্রান্ত হওয়ায় কমিটির নিয়মিত পুলিশ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবিধার্থে সরকার হেনরি ফটনকে সভাপতি করে একটি পৃথক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্ট ১৮৯২ সালে সরকারের নিকট জমা দেয়া হয়। রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানসহ একজন তদন্তকারি অফিসারের গড় তদন্ত সংখ্যা ১০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

(খ) পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর তদন্তকারি কর্মকর্তার জন্য প্রতি মাসে যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

(গ) প্রতি জিলা হেড কোয়ার্টারে 'Special Reserve' বাহিনীর সুপারিশ করা হয়। আর সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ দানের কথা ব্যক্ত করা হয়।

এইসব সুপারিশের মধ্যে তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের বিষয়টি গৃহীত হয়। তবে ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন Report প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয় নি।[৪৫]

১.৯ পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩

বীম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং পুলিশের ভাবমূর্তি উদ্ধার ও এ বিভাগের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনের নির্দেশে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। যে সব কারণে এই কমিশন গঠন করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

ক. বিদ্যমান পুলিশের দুর্নীতি ও অদক্ষতা
খ. তদন্তকারি অফিসারের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া
গ. পুলিশের অন্যায় আচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার
ঘ. অপর্যাপ্ত পরিদর্শক।

৪৫. *Ibid*, p-87

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন গঠিত হয়–

(১) এ, এইচ, এল ফ্রেসার, মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনার, সভাপতি
(২) বিচারপতি ক্যানডি; বোম্বে হাইকোর্টের জর্জ
(৩) রামেশ্বর সিং, দারভাঙ্গার মহারাজা, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য
(৪) নিবাস রাগাভা আইয়ানগার, অতিরিক্ত সদস্য, মাদ্রাজ গভর্নর কাউন্সিল।
(৫) লেঃ কর্ণেল জে, এ, এল মন্টোগোমারী; পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নর কাউন্সিলের সদস্য।
(৬) ডব্লিউ, এম, কলভিন, এলহাবাদের ব্যারিষ্টার।
(৭) এ, সি হ্যানকিন, হায়দারাবাদ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং কমিশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন মাদ্রাজ প্রদেশের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এইচ,এ স্টুয়ার্ট।[৪৬]

ব্যাপক কার্য-পরিধি নিয়ে ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন ছিল এ কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা কমিশনের নিকট প্রেরিত স্থানীয় কমিটির মতামতে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। তবে, কমিশন বিভিন্ন স্থান ভ্রমন ও তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত যাছাই সাপেক্ষে কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ পেশ করে। এ সুপারিশে পুলিশের সংগঠন, নিয়োগ-প্রশিক্ষণ, বেতন, রেলওয়ে পুলিশ, নদী পুলিশ, সি-আইডি পুলিশ (অপরাধ তদন্ত বিভাগ), গ্রাম্য-পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সম্পর্ক, অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ প্রভৃতি বিষয়ে গঠনমূলক দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়। কমিশন রিপোর্টে বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে ভারতের জন্য একটি একক পুলিশ এ্যাক্ট গঠন ও বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশ ইন্সপেক্টরদের বার্ষিক পুলিশ রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা বলা হয়। কমিশন-সদস্যদের সকলে রিপোর্টের সুপারিশের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেও একজন সদস্য (দারভাঙ্গার মহারাজা, রামেশ্বর সিং) দুইটি বিষয়ে দ্বি-মত পোষণ করেন। তিনি পুলিশের সুপিরিয়র পদে নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং জিলা পুলিশের কার্যাবলীতে ম্যাজিস্ট্রেটের তদারকীকে সমর্থন করেন। তা সত্ত্বেও, ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে পুলিশের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এসব সুপারিশ সমূহ আমাদের পুলিশের দিক-নির্দেশন হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪৬. *Report of the Indian Police Commission, 1902-03.* appendix (1).

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
পুলিশ সংগঠন

২.১ পুলিশ সংগঠন

অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার উন্নতির মাধ্যমে ঐক্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে কোন সংগঠনকে চলমান রাখা সম্ভবপর। পুলিশ সংগঠনও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।[১] পুলিশ সংগঠনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত। সদস্যদের মধ্যে কর্মের বণ্টন, মানসম্মত অনুশীলন স্থিরকরণ, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরিসঞ্চালনকরণ, পারস্পরিক যোগাযোগ পদ্ধতির অব্যাহতকরণ, প্রশিক্ষণ ও সদস্যদেরকে এর আদর্শের অন্তর্গতকরণ এসব উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।[২] আসলে কোন একক সঙ্গা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পুলিশ সংগঠনের পরিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদের সমন্বয়ে গঠিত কোন সাংগঠনিক অবকাঠামোতে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চেইন অব কমান্ড (Chain of Command) বজায় রাখাসহ অন্যান্য কাজকর্মের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাকেই এক্ষেত্রে সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ পর্বের প্রথমদিকে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে ১৮২৯ সালে রবার্ট পীলের উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে ব্রিটেনে আধুনিক পুলিশ প্রবর্তিত হলে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো পরিপক্কতা লাভ করতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট ৫-এর মাধ্যমে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৮৬১ সালের এ্যাক্টের মাধ্যমে গঠিত পুলিশ ব্যবস্থা তৎকালিন পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নয়নে ব্যর্থ হয়। তাই, পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন পদক্ষেপ সূচিত হয় এবং গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে পুলিশ ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে। যদিও এক্ষেত্রে ১৮৬১ সালের পুলিশ সংগঠনই মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পুলিশ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে গঠিত ১৯০২/০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বিশেভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সুপারিশে পুলিশের সাংগঠনিক রূপরেখা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি পেশ করা হয়। বাংলায় পুলিশের ক্ষেত্রেও এই একই সুপারিশ প্রযোজ্য ছিল।

১. R. S. Bunyard, *Police Organzation and Command*, p. 62.
২. A.B.M.G. Kibria., *Police Administration in Bangladesh*, p. 17.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০২/০৩ সালে পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে পুলিশ বিভাগকে নিয়মিত পুলিশ ও বিশেষ পুলিশ হিসেবে বিভক্ত করে উল্লেখ করা হলেও পরবর্তীকালে পুলিশ ফোর্সকে মিলিটারি পুলিশ, সিভিল পুলিশ ও গ্রাম্য পুলিশ এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিভিল পুলিশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পুলিশের জিলা সংগঠনসহ নিয়মিত পুলিশ, নদী পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, সি আই ডি পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের মত সংগঠনসমূহ। আর গ্রাম্য পুলিশ ও মিলিটারি পুলিশকে স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ এবং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ পর্যন্ত উল্লেখিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২ ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টে নিয়মিত পুলিশ সংগঠন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ

পুলিশ কমিশন রিপোর্টে পুলিশ ফোর্সকে ইউরোপীয় সার্ভিস ও প্রাদেশিক সার্ভিস হিসেবে গঠনের কথা বলা হয়। ইউরোপীয় সার্ভিসের সামগ্রিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনা করা হবে ইংল্যান্ডে আর প্রাদেশিক সার্ভিসের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পন্ন করা হবে এদেশ থেকে। রিপোর্টের সুপারিশে পুলিশ সার্ভিসকে Upper Sub-ordinate service এবং Lower sub-ordinate service-এ বিভক্ত করা হয়। ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরদের সমন্বয়ে Upper Sub-ordinate গঠিত হবে এবং Lower sub-ordinate-এর অন্তর্ভুক্ত হবে কনস্টেবল ও হেড-কনস্টেবলগণ।

রিপোর্টের সুপারিশে জিলা পর্যায়ে একজন মনোনীত জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসকে ইনস্পেক্টর জেনারেলের অফিস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর বড় প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রদেশকে কতকগুলো রেঞ্জে বিভক্ত করে প্রত্যেক রেঞ্জের পুলিশ প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেলের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে জিলা সুপারিনটেনডেন্টকে জিলা পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করা হয়। যেসব জিলা বেশি বড় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন সেসব জিলায় অবশ্য ভিন্ন চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রাদেশিক সার্ভিসের জন্য ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের একটি গ্রেড সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। অবশ্য প্রাদেশিক সার্ভিসের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সুপারিনটেনডেন্টের পদ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের পদমর্যাদা হবে সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের পদমর্যাদার সমপর্যায়ের। প্রত্যেক জিলায় একজন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট বা ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এবং বড় জেলার ক্ষেত্রে অনুরূপ একাধিক অফিসার নিয়োগদানের কথা বলা হয়।

এছাড়া কমিশন প্রতিবেদন এ প্রত্যেক জিলাকে পাঁচটি থেকে আটটি পুলিশ ষ্টেশনের সমন্বয়ে সার্কেলে বিভক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে, এক্ষেত্রে বড় শহরের এর চর্তুপার্শ্বের এলাকা নিয়ে একটি সার্কেল গড়ার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রত্যেক সার্কেলের পুলিশ কার্যাবলী পরিচালনা ও তদারকীর জন্য একজন ইনসপেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আর প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করা হয় ৩৮৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন নিয়ে যার দায়িত্বে থাকবেন একজন সাব-ইনস্পেক্টর।

প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে একজন হেড-কনষ্টেবলকে ষ্টেশন লেখকের দায়িত্ব পালন এবং দ্বিতীয় একজন হেড কনষ্টেবল সাব-ইন্সপেক্টরকে সাধারণ কার্যাবলীতে সাহায্য করার দায়িত্ব পালন করবেন। পুলিশ সংগঠনের সর্বনিম্নস্তরের পুলিশ কনষ্টেবলগণ প্রতিরক্ষা, এসকোর্ট ও সহচর গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিশন রিপোর্টে প্রত্যেক জিলায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জিলার প্রত্যেক গ্রুপে অস্ত্রধারী পুলিশ প্রয়োগের কথা বলা হয়। বঙ্গীয় প্রদেশে প্রত্যেক জিলায় আর্মড ফোর্সকে জিলা রিজার্ভ পুলিশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যা ২৫ জন অস্ত্রধারী নিয়ে গঠিত হবে। তবে, এই ফোর্স জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের বরাদ্দ ও হুকুম ছাড়া কোন সাধারণ দায়িত্ব পালন করবে না। এছাড়া হেডকোয়ার্টারে কিছু সংখ্যক দক্ষ অস্ত্রধারী পুলিশের সার্বক্ষনিক উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে যে কোন সময় তারা প্রয়োজনীয় ডাকে সাড়া দিতে পারে।

হেড কোয়ার্টার ফোর্সের দায়িত্বে একজন ইউরোপীয় ইন্সপেক্টর এবং সে সাথে একজন ইউরোপীয় সার্জেন্ট থাকার কথা বলা হয়। পুলিশকে অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় বিভক্ত করা হয়নি। তবে মিলিটারী পুলিশ অবসানের সুপারিশ ছিল কমিশন রিপোর্টে। সে সঙ্গে অতি জরুরি না হলে ব্যয় বহুল বিধায় অশ্ব-পুলিশ না রাখার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া কোর্ট ইনস্পেক্টর বা কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টরগণ সরকারের আইন কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের পক্ষে কোর্টে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০২-০৩ সালের কমিশন সুপারিশের আলোকে পুলিশের কার্যক্রম ও Chain of Command বজায় রাখার জন্য পুলিশ সাংগঠনিক ক্রমস্তরকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করা যায়–

পদবী	দায়িত্ব
ইন্সপেক্টর জেনারেল — (আই. জি)	সমগ্র প্রদেশের পুলিশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করা।
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল — (ডি. আই. জি)	প্রত্যেক রেঞ্জের পুলিশ প্রশাসনিক প্রধান। প্রদেশকে কতকগুলো পুলিশ রেঞ্জে বিভক্ত করা হয়– আর প্রত্যেক রেঞ্জ গঠিত হয় কতিপয় জিলায় সমন্বয়ে। প্রত্যেক প্রদেশে রেল পুলিশের প্রশাসনকি দায়িত্বও অর্পিত ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের ওপর।
পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট — (এস. পি)	প্রত্যেক জিলা পুলিশের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করা।
সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট/ — ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট [৩]	প্রত্যেক জিলার সাব-ডিভিশন বা মহকুমা পুলিশের দায়িত্ব ছিল এদের ওপর। জিলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের সহায়তা করা ছিল তাদের কাজ।
ইনসপেক্টর —	প্রত্যেক সার্কেলের পুলিশী কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করা। উল্লেখ্য যে, কতিপয় পুলিশ স্টেশনের সমন্বয়ে পুলিশ-সার্কেল গঠন করা হয়।
সাব-ইন্সপেক্টর (এস. আই) —	প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনের দায়িত্ব পালন।
সার্জেন্ট —	শহর, ক্যান্টনমেন্ট, সমুদ্র বন্দর, বড় রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি স্থানের দায়িত্ব পালনসহ ইউরোপীয় ইন্সপেক্টরদের সহায়তা করা ছিল এদের দায়িত্ব। [সার্জেন্ট সাধারণত ইউরোপীয় বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল]
হেড কনস্টেবল —	প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে স্টেশন রাইটার এর দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একজন হেড কনস্টেবল রাখা হয়। সাব-ইন্সপেক্টরদের সহায়তা করার জন্য একজন দ্বিতীয় হেড-কনস্টেবল রাখা হয়।
কনস্টেবল —	পুলিশ সংগঠনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারি।

পুলিশী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জিলা পুলিশ প্রশাসনকে Operational Unit বা কার্যক্রম পরিচালনার একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক জিলাকে পরে কতকগুলো পুলিশ স্টেশনে বিভক্ত করে স্টেশনের ওপর দায়িত্ব বন্টন করা হয়। জিলা পর্যায়ে জিলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টই পুলিশ প্রশাসনের চালিকা শক্তি।

৩. প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের পদ সৃষ্টি করা হয়– আর এ পদ ছিল সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের সম মর্যাদার।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ পুলিশ সংগঠন সম্পর্কিত সুপারিশের বাস্তবায়ন ও তার পর্যালোচনা

১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ মত বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের দরুণ প্রশাসনিকভাবে পুলিশ ফোর্সের স্বল্পতা দেখা দেয়। সাবেক আসাম প্রদেশ, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগস্থ জেলাসমূহ নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ।[৪] এর পূর্বে বাংলায় (কলকাতাসহ) দুটি স্বাধীন পুলিশ সংগঠন ছিল। এর একটি ছিল বেঙ্গল পুলিশ– যার প্রধান ছিলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং অপরটি ছিল কলকাতা পুলিশ– যার প্রধান ছিলেন কলিকাতা পুলিশ কমিশনার। ১৯০৪ সালে বঙ্গ প্রদেশের পুলিশ কাঠামোর সাংগঠনিক রূপ ও জনবল ছিল নিম্নরূপ ঃ[৫]

১৯০৪ সালে বাংলার পুলিশ জনবল ও সাংগঠনিক রূপ –

পদবী		জনবল
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	—	০১ জন
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	—	০২ জন
সুপারিনটেনডেন্ট	—	৩১ (+ ২) জন
সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট		
ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট	—	x
ইন্সপেক্টর	—	১৩৮ জন
সাব-ইন্সপেক্টর	—	১১০৪ জন
সার্জেন্ট	—	২২ জন
হেড কনস্টেবল	—	১১২১ জন
কনস্টেবল	—	১২৮২৪ জন

৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, পৃঃ ৩১২।
৫. W. R. Gourlay, *Op. cit. P.* 144.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ ও ১৯১৫ সালে কলকাতা পুলিশের জন্য বরাদ্দকৃত কলকাতা পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও জনবল নিচে সারণির মাধ্যমে প্রদত্ত হল।

সারণি-১

১৯০৬ সালে কলকাতা পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও জনবল, ১৯০৬ সালে প্রস্তাবকৃত জনবল এবং ১৯১৫ সালে বরাদ্দকৃত জনবল

পদবী	১৯০৬ সালে বরাদ্দকৃত জনবল	১৯০৬ সালের জন্য প্রস্তাবকৃত জনবল	১৯১৫ সালে বরাদ্দকৃত জনবল
পুলিশ কমিশনার	১ জন	১ জন	১ জন
ডেপুটি কমিশনার	১ ,,	৬ ,,	৬ ,,
সহকারী কমিশনার	----	১ ,,	১ ,,
সুপারিনটেনডেন্ট	৮ ,,	২ ,,	২ ,,
ইন্সপেক্টর	৫৭ ,,	২৯ ,,	৩২ ,,
সাব-ইন্সপেক্টর	২১ ,,	৮৪ ,,	১০৯ ,,
ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট	৬৫ ,,	৯৪ ,,	১৩০ ,,
সল্ট সাব-ইন্সপেক্টর বা দারোগা	৩ ,,	৩ ,,	----
ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট	৮১ ,,	----	----
কর্পোরাল	১৮৩ ,,	----	----
হেড কনস্টেবল	৭ ,,	৩৩৮ ,,	৪৬২ ,,
সওয়ার (হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবল)	৩৫ ,,	২০ ,,	২০ ,,
কনস্টেবল	২,৭১৪ ,,	২,৭৭৮ ,,	৩,৮০৫ ,,
ষ্টীম লঞ্চ ষ্টাফ	৫ ,,	৫ ,,	১০ ,,
বোটম্যান	১৩৩ ,,	১৩৩ ,,	১৫৩ ,,

উৎস ঃ W. R Gourlay, *A Contribution towards a History of the Police in Bengal*, Calcutta, Bengal secretariat press, 1916 p.p (147-148)

উপরের সারণি থেকে কলকাতা পুলিশের সাংগঠনিক স্তর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। ১৯০৬ সালের বরাদ্দকৃত জনবল ও ১৯০৬ সালে প্রস্তাবকৃত জনবল লক্ষ করলে দেখা যায় যে পুলিশ কমিশনের প্রস্তাবে ৫ জন ডেপুটি কমিশনার, ১ জন সহকারি কমিশনার, ৬০ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৩৩ জন ইউরোপীয় সার্জেন্ট, ৩৩১ জন হেড কনস্টেবল, ৬৪ জন কনস্টেবল বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে, সুপারিনটেনডেন্ট ৬ জন, ইন্সপেক্টর ৩৮ জন, সওয়ার ১৫ জন হ্রাস করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫ সালে এসে দেখা যায় যে ১৯০৬ সালে প্রস্তাবকৃত জনবলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পদে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–ইন্সপেক্টর ৩ জন, সাব-ইন্সপেক্টর ২৫ জন, ৩২ জন সার্জেন্ট, ১২৬ জন হেড কনস্টেবল, ১০২৫ জন কনস্টেবল, স্টীম লঞ্চ স্টাফ ৫ জন এবং বোটম্যান ২০ জন। এখানে আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে ১৯০৬ সালে বরাদ্দকৃত কলকাতা পুলিশ জনবলের মধ্যে ৮১ জন ভারতীয় সার্জেন্ট থাকলেও ১৯০৬ সালের প্রস্তাবকৃত জনবলে কোন ভারতীয় সার্জেন্ট ছিল না। এমন কি ১৯১৫ সালে ১৩০ জন ইউরোপীয় সার্জেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ভারতীয় সার্জেন্ট পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় নি।

এছাড়া ১৯০২-০৩ সালের কমিশনের সুপারিশে পুলিশ সংগঠনকে অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় বিভক্ত না করার কথা জোরালোভাবে বলা হয়। কিন্তু এ সুপারিশ অল্প কয়েক বছর কার্যকরী হলেও বাংলায় ১৮১২ সালে আবার পুলিশ ফোর্সকে অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় বিভক্ত করা হয়।[৬] এছাড়া অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৬ সালে কোর্ট ইনসপেক্টরের পদবী পরিবর্তিত করে প্রোসিকিউটিং ইন্সপেক্টর রাখা হয়।[৭]

১৯০৪ সালের পরে নিয়মিত পুলিশের সাংগঠনিক জনবলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ১৯০৫ সালে সুপিরিয়র স্টাফদের মধ্যে ৫৪ জন জিলা সুপারিনটেনডেন্ট ও ৪৪ জন সহকারী জিলা সুপারিনটেনডেন্ট এর মধ্যে ২০ জন জিলা সুপারিনটেনডেন্ট ও ২০ জন সহকারী জিলা সুপারিনটেনডেন্টকে Eastern Bengal ও আসামে বদলি করা হয়। তবে, ১৯০৫ সালে সাব-অর্ডিনেটদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়। এই বৃদ্ধির সংখ্যা পদ অনুযায়ী ছিল নিম্নরূপ ঃ

---

৬. N. A. Razvi, *Op. cit.* p. 102.

৭. *Ibid*, p. 102.

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সপেক্টর ৫৩ জন, সাব-ইন্সপেক্টর ৯০ জন, হেড কনস্টেবল ২১৭ জন এবং কনস্টেবল ৫৪৩ জন।[৮] এ সময়ে টাউন চৌকিদারের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। আগে যে সব ফোর্স জিলা রিজার্ভ পুলিশ হিসেবে বিবেচিত হত, ১৯০৫ সালে তাদেরকে (Armed) আর্মড পুলিশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই আর্মড পুলিশ ফোর্সের দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত সাড়া দেয়া। ১৯০৫ সালে আর্মড ফোর্সের সংখ্যা ছিল— ইন্সপেক্টর — ২৪ জন, সার্জেন্ট — ১০ জন, হেড কনস্টেবল — ৯৪ জন এবং কনস্টেবল — ১১৫০ জন।[৯]

১৯০৬ সালে টাউন পুলিশের শক্তিসামর্থ ছিল ইন্সপেক্টর – ১০ জন, সার্জেন্ট – ৫ জন, হেড-কনস্টেবল – ৩৫৭ জন এবং কনস্টেবল – ১৪১৮ জন। তাদের কাজ ছিল শহর এলাকায় টহল দেয়া। আর আর্মড পুলিশ এর সংখ্যাও বেড়েছে – এই সময়।[১০] ১৯০৬ সালের পুলিশ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এ বছরে বঙ্গীয় প্রদেশে ৩৩টি জিলাকে টেরিটোরিয়াল চার্জে বিভক্ত করে প্রতি চার্জের দায়িত্ব দেয়া হয় তৃতীয় ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলদের।[১১] এ ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসনকে আরো গতিশীল করে। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট-এর অধীনে জিলা পুলিশ প্রশাসন নিয়মিতভাবে সংগঠিত হয়। মাঝে মধ্যে পুলিশ জনবল বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১০ সালে সাব-অর্ডিনেট পুলিশ জনবল দাঁড়ায় – ২২৪৯৪ জন।[১২] এই সংখ্যা পূর্বের তুলনায় পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় আর্মড রিজার্ভ পুলিশ সংখ্যা ১৯১২ সালের দিকে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার জিলা সমূহে বৃদ্ধি করা হয়। এ সময় Civil Police-এর সাব-অর্ডিনেট জনবল ছিল— ইন্সপেক্টর – ২৩২ জন, সার্জেন্টস – ৪৪ জন, সাব-ইন্সপেক্টর – ১৫৮০ জন, হেড-কনস্টেবল – ২১২৩ জন এবং কনস্টেবল সংখ্যা – ১৬,৫১২ জন। ১৯১১ সালে সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্বের একটা অংশ অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্টকে দেয়া হয়।[১৩]

---

৮. *Report on the Administration of the Police of the Lower provinces, Bengal presidency for the year* 1905. p.1.
৯. *Ibid*, P. 8.
১০. *Report on the Administration of Bengal*, 1906, p.8.
১১. *Report on the Administration of Bengal*, 1906, P. 11
১২. *Report on the Administration of Bengal*, 1910, P. 27
১৩. *Report on the Administration of Bengal*, 1912, P. 3

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে বাংলা, মদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোম্বের সাব-অর্ডিনেট স্টাফ ও সুপিরিয়র অফিসার সংখ্যার একটা খতিয়ান নিম্নে দেয়া হল।[১৪]

প্রদেশ	সন	সুপিরিয়র অফিসার	সাব-অর্ডিনেট অফিসার
মদ্রাজ	১৯১৩	১১৪	৩২,৭০১
পাঞ্জাব	১৯১৩	৭৩	২০,৪২১
বোম্বে	১৯১৩	৯১	২৪,১৪৪
বেঙ্গল	১৯১৩	১২১	২০,২৬৫

এই চিত্রের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে এমনটা ধারণা করা যায় যে, ১৯১৩ সালের বেঙ্গলের সুপিরিয়র অফিসার সংখ্যা প্রদত্ত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় একটু বেশি ছিল। এই সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যা, আয়তন, অপরাধ সংখ্যা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে, সাব-অর্ডিনেট অফিসারদের সংখ্যা মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

যা হোক, ১৯১৫ সালের দিকে পুলিশের সুপিরিয়র অফিসারদের ক্ষেত্রে Deputy Inspector General of Police, এবং Second Assistant Inspector General of Police নামে দুইটি পদ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এই সময় থেকে হেড-কোয়ার্টার ফোর্সকে আর্মড ফোর্স হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৫] নিচের সারণিতে ১৯১৮-১৯২১ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রদেশের আয়তন, জনসংখ্যা এবং থানা সংখ্যাসহ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত পুলিশ স্টাফদের খতিয়ান দেয়া হল।

১৪. *Report on the Police Administration in Bengal Presidency* for the year 1914, p.3.
১৫. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency* for the year 1915, p.2.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

১৯১৮—১৯২১ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রদেশের আয়তন, জনসংখ্যা, থানা সংখ্যাসহ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন পদে নিয়োজিত স্টাফদের একটি খতিয়ান

	বর্গমাইলে আয়তন	জনসংখ্যা	থানা সংখ্যা	প্রতি থানায় গড় আয়তন বর্গমাইলে	থানায় গড় জনসংখ্যা	ইম্পেরিয়াল সার্ভিসেস পুলিশবল	ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট জনবল	ইন্সপেক্টর জনবল	সাব-ইন্সপেক্টর জনবল	সার্জেন্ট জনবল	হেড কনস্টেবল জনবল	কনস্টেবল জনবল	মোট সুপিরিয়র স্টাফ	মোট সাব-অর্ডিনেট স্টাফ
বঙ্গ প্রদেশ														
১৯১৮	৭৮০২৯	৪৪,৪৫০১৬০	৬৮০	১০৮.১	৬৫৩৭২	১০০	২৭	২৪৯	১৭০৬	৫২	২৪৮৭	১৭৭৬৮	১২৭	২২২৬২
১৯১৯	৭৩০২৯	৪৪,৪৫০১৬০	৬৮৫	১০৭.১	৬৪৮৯৫	১০২	২৭	২৫২	১৭৫২	৫২	২৫০১	১৮৫২০	১২৯	২৩০৫৭
১৯২০	৭৩০২৯	৪৫৫৭৬৫১৭	৬৬৮	১০৬.৮	৬৬২৪৮	১০৪	২৮	২৫১	১৮৩৩	৫২	২৫৪৭	১৯১৬৯	১৩২	২৩৮৫২
১৯২১	৭৩০২৯	৪৫৫৭৬৫১৭	৬৬৮	১০৬.৮	৬৬২৪৮	১০৪	২৮	২৫১	১৮৩৩	৫২	২৫৪৭	১৯১৬৯	১৩২	২৩৮৫২

উৎস ঃ Government of Bengal. A Statement of the Strength of the Police Force in Bengal and of certain Pending Schems 1921, p.1.

১৯১৮—১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত বিভিন্ন স্তরের পুলিশী জনবলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে জনসংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির সাথে পুলিশের সাংগঠনিক শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ১৯২৬ সালে পটুয়াখালি ও বাকেরগঞ্জ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য স্পেশাল পুলিশ ফোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। এই স্পেশাল ফোর্স অবশ্য প্রত্যেক জিলা হেড-কোয়ার্টারে এবং কিছু নির্বাচিত মহকুমায় জরুরি ফোর্স হিসেবে রাখা হয়। যাতে প্রয়োজন মত জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় এই স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করা যায়। প্রতিরক্ষামূলক পাহারা এবং কোষাগার ও উপ-কোষাগার পাহারাদানের জন্য তাদের নিয়োগ করা হয়। তবে, এই পুলিশকে স্থানীয় যে কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য জিলা হেড-কোয়ার্টার বা সাব-ডিভিশনেও রাখা হয়।[১৬] এরপর পুলিশ সংগঠন একই ধারায় অব্যাহত ছিল।

১৬. *Report on the Administration of Bengal*-1927, p. 7.

Dhaka University Institutional Repository

তবে, ১৯৩৭ সালে এসে Twynam—Gordon Comittee পুলিশের কিছু সংস্কারমূলক সুপারিশ করলেও তাতে পুলিশ সংগঠনের কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩৭ সালে কিছু অস্থায়ী পদকে বিলোপ করা হয়। ১৯৩৭ সালে সাব-অর্ডিনেট পুলিশ সংখ্যা ছিল – ইন্সপেক্টর –২৮৯ জন, সাব-ইন্সপেক্টর –১৮৮৪ জন, সার্জেন্ট –৪৮ জন, সহকারি সাব-ইন্সপেক্টর –১৬১৯ জন, হেড-কনস্টেবল –১১৫১ জন এবং কনস্টেবল –২০,৩৯৪ জন।[১৭]

সাংগঠনিক কাঠামোগত কোন পরিবর্তন ছাড়া কেবল পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল পরবর্তী বছরগুলোতে। যেমন ১৯৪০ সালে সাব-অর্ডিনেট এর ক্ষেত্রে পুলিশ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,৪০৫ জন।

সারণি-৩

১৯৪০ সালে Sub-Ordinate পুলিশের বিভিন্ন পদে নিয়োজিতদের পদ অনুযায়ী মোট সংখ্যা ও শতকরা হার

পদবী	প্রকৃত সংখ্যা	হিন্দু	মুসলিম	শিডিউল কাষ্ট	ইউরোপীয়	এংগলো ইন্ডিয়ান	ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান	অন্যান্য
ইন্সপেক্টর	২৮৭	১৮৮ ৬২.৫%	৬৬ ২৩%	১ .৩%	২৫ ৮.৭%	.৩%	—	৪ ১.৩৯%
সাব-ইন্সপেক্টর	১৪৯৪	৮৩৫ ৫৬.৩%	৬০৬ ৪০.৮%	১০ .৬%	—	—	৩ .২%	৩০ ২.০২%
সার্জেন্টস	৪৬	—	—	—	২৪ ৫২.২%	২২ ৪৭.৮%	—	—
সহঃ সাব-ইন্সপেক্টর	১৫৬০	১০০১ ৬৪.২৬%	৪৮২ ৩০.৯%	৫৩ ৩.৪%	—	—	১ ০৬%	২৩ ১.৪৭%
হেড কনষ্টেবল :								
আর্মড পুলিশ	৪৩২	২৮৪ ৬৫.৭৪%	৮৩ ১৯.২১%	১ .২৩%	—	—	—	৬৪ ১৪.৮১%
নন-আর্মড পুলিশ	৬০৫	৩৯৯ ৬২.৯০%	১৭৬ ২৯.০৯%	২ .৩৩%	—	—	১ .১৬%	২৭ ৪.৪৬%
মোট হেড কনষ্টেবল	১০৩৭	৬৮৩ ৬৫.৮৫%	২৫৯ ২৪.৯৯%	৩ .২৯%	—	—	১ .৯%	৯১ ৪.৭৭%
কনষ্টেবল :								
আর্মড	৪৯৭১	২৭৩১ ৫৮.৫%	১০৫৭ ২২.০৪%	৫২ ১.১%	—	—	১২ .২৫%	৮১৯ ১৭.৫%
নন-আর্মড	১৫,৮০৩	৯৭৭৯ ৬২.৭%	৫০৬১ ৩২.৪%	৩১৪ ২%	—	—	৫০ .৩%	৩৯৯ ২.৬%
মোট কনষ্টেবল	২০২৭৪	১২৫১০ ৬১.৭%	৬১৯৮ ৩০.২%	৩৬৬ ১.৮%	—	—	৬২ .৩%	১২১৮ ৬%

উৎস ঃ Government of Bengal, *Report on the Police Administration of the Province of Bengal*, excluding Calcutta and its suburbs for the year 1940, p. 5

১৭. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency*, 1937, p.5.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ৩ (তিন) এর ঘর থেকে কলামগুলোতে মোট সংখ্যার নিচে শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে। সার্জেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৪৬ জনের মধ্যে ২৪ জন ইউরোপীয় এবং ২২ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। অর্থাৎ কোন বঙ্গসন্তানদের স্থান ছিল না সার্জেন্ট পদে। এছাড়া বিভিন্ন পদে হিন্দুদের নিয়োগ সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় পূর্বের মতই প্রাধান্য বজায় ছিল।

২.৪ নৌ-পুলিশ

বাংলায় নদী পুলিশ একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। নদী পুলিশ সৃষ্টি করা হয় ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট ৫ অনুযায়ী। প্রথমে এটি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে গঠিত হলে ১৮৬৩ সালে এর অপর্যাপ্ততা অনুভূত হয় বেশি মাত্রায়।[১৮] আসলে নৌ-পথে চলাচলে জলদস্যুদের আক্রমনের হাত থেকে চলাচলকারিদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই নৌ-পুলিশের সৃষ্টি। ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে বাংলা ও আসামে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠনের কথা বলা হয় যার মুখ্য কাজ হবে নৌ-পথে টহল দান করা। এই টহলদানের জন্য রাখা হয় লঞ্চ ও কিছু সংখ্যক নৌকা এবং টহলকারিরা হবে সশস্ত্র।[১৯] অবশ্য এর পূর্বে ১৮৬৩ সালে নৌ-পুলিশের স্বল্পতার অবসান করে এর আয়তন ও কলেবর বৃদ্ধির জন্যও CID পুলিশের তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২০] ফলে কিছু টহল নৌকা এবং ভাসমান ফাঁড়ি সংযোজন করা হয়। এছাড়া ১৮৯৯ সালের পরে নদী পুলিশের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের পুনর্গঠনসহ শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টে বাংলা ও আসামের নদীপথে চলাচল উপযোগী যানবাহনের নিরাপত্তার জন্য নৌ-পুলিশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯০৫ সালে ইন্সপেক্টর – ২ জন, সাব-ইন্সপেক্টর – ৩২ জন, হেড-কনস্টেবল – ২৫ জন এবং ২৪৭ জন কনস্টেবল সমন্বয়ে ছিল নৌ-পুলিশের জনবল।[২১]

---

১৮. N. A. Razvi, *Op, cit.* p. 105

১৯. *Report of the Indian Police Commission* 1902-03, Para-113.

২০. N. A. Razvi, *Op, cit.* p.105.

২১. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year* 1916, p.1.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৮ সালে ২৪ পরগনা, যশোহর ও খুলনার নদীতে নদী টহল কার্যক্রম চলে। এই বছর নৌ-পুলিশের সংগঠনকে ভিত্তি দেয়ার জন্য কলিকাতা পোর্ট সুপারকে নিয়োজিত করা হলেও অর্থাভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।[২২] ১৯১০ সাল থেকে নৌ-পুলিশ ২৪ পরগনায় সাতটি টহল বোট, খুলনায় ছয়টি এবং যশোহরে একটি টহল বোটের মাধ্যমে টহল কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। নৌ-পুলিশ জলদস্যুতা প্রতিরোধ করা ছাড়াও অন্যান্য কল্যাণমূলক এমনকি উদ্ধার কাজে সাহায্য করতো। প্রতিবছর প্রায় একশত জন ডুবন্ত যাত্রীকে উদ্ধারসহ ব্যস্ত নৌ-বন্দর ও নৌযান চলাচল নিয়ন্ত্রণে নৌ-পুলিশ তৎপর থাকে।[২৩]

পরবর্তীকালে নৌ-পুলিশের কার্যক্রম সফলতার সাথে চলতে থাকে। ১৯১৫ সালে ইন্সপেক্টরদের সংখ্যা বাড়ানো হয় তবে কিন্তু কনস্টেবল সংখ্যা কমানো হয়। ১৯১৬ সালে নৌ-পুলিশ বিশেষ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কিছু সাধারণ কার্যাবলীও সম্পাদন করতে থাকে। এই বছর নৌ-পুলিশের জন্য নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়। নৌ-পুলিশের জন্য মেঘনা– বরিশাল বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ সময় পাঁচটি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হয় যার মধ্যে চারটি ভাসমান স্টেশন সংযোগ করা হয়। তবে দুটি স্টেশন আসাম প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হয়।[২৪] পরবর্তী বছরগুলিতে নৌ-পুলিশের উন্নতির জন্য এর কাঠামোগত কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৮–১৯ সালের দিকে পাঁচটি বাষ্পচালিত লঞ্চ, দুইটি ভাসমান থানা, ১টি বড় নৌকা এবং ৪০টি ডিঙ্গি নৌকা সংযোগ করে নৌ-পুলিশের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই বছরে নৌ-পুলিশ প্রায় ৭৮ জন যাত্রীকে ডুবন্ত বাহন থেকে উদ্ধার করে।[২৫]

---

২২. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency*, 1908, p. 37.

২৩. N. A. Razvi, *Op. cit.* p.105.

২৪. *Report on the Administration of Bengal*, 1915-16, Para-73.

২৫. *Report on the Administration of Bengal*, 1918-19, Para-75.

Dhaka University Institutional Repository

নৌ-পুলিশের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আরো সংস্কারও জরুরি হয়ে উঠে। নানা প্রতিকূলতা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে নৌ-পুলিশ পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি অর্জনে বাঁধাগ্রস্থ হয়। ১৯২১ সালে নদী পুলিশ সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে Search Light বা সন্ধানী আলোযুক্ত লঞ্চ এর ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই সময় এসব অঞ্চলে কোন বড় ধরনের নৌ-ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার খবর সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় না।[২৬] ১৯২১ সালে নদী পুলিশের মোট নিয়োজিত শক্তি (সুপিরিয়র ও ইনফেরিয়র স্টাফদের) নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো ঃ

সারণি-৪

১৯২১ সালে নদী পুলিশে নিয়োজিত জনবল

নৌ পুলিশ স্টেশন সংখ্যা	২৬	
নৌ পুলিশ ফাঁড়ি সংখ্যা	---	
পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	১ জন	সুপিরিয়র স্টাফ
অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	---	
সহকারি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	---	
ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	---	
মোট সুপিরিয়র স্টাফ	১ জন	
ইন্সপেক্টর	৫ জন	
সার্জেন্ট	---	
সাব-ইন্সপেক্টর	৪২ জন	
সহকারি সাব-ইন্সপেক্টর	৩০ জন	ইনফেরিয়র স্টাফ
হেড-কনস্টেবল	২ জন	
কনস্টেবল	২৭৭ ,,	
মোট ইনফেরিয়ার স্টাফ	৩৫৬ ,,	

উৎস ঃ Government of Bengal, A Statement of the Strength of the Police Force in Bengal and of certain Pending Schemes 1921, P. 107.

১৯২১ সাল পর্যন্ত নৌ পুলিশের স্টেশন সংখ্যা ২৬টি ছিল কিন্তু কোন নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ছিল না। মাত্র একজন সুপারিনটেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে এ বিভাগটির কার্যক্রম চলছিল। ১৯২২-২৩ সালে নৌ-পুলিশের আরো কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই সময় আর্থিক বরাদ্ধ সংকোচনের জন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী পুলিশ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এ বছরে নারায়নগঞ্জ ডক-ইয়ার্ড স্থাপন করা হয়। কেবল নদী পুলিশ সংক্রান্ত নয় বরং অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজনীয় নৌ-যান তৈরি করাও ছিল এর কাজ।[২৭] নৌ-পুলিশ প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটে ১৯৩৫ সালে। এ বছরে নৌ-পুলিশকে স্বতন্ত্র পুলিশ সংগঠন হিসেবে বিলোপ করে জিলা পুলিশ সংগঠনের সাথে সংযুক্ত করা হয়।[২৮] এর মধ্যে নৌ-পথে বিভিন্ন ডাকাতি কার্যক্রম হ্রাস-বৃদ্ধি পেলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নৌ-পুলিশ জিলা পুলিশের সাথে সংযুক্ত ছিল।

২৬. *Report on the Administration of Bengal*, 1921-22, Para-33.
২৭. *Report on the Administration of Bengal*, 1922-23, Para-64.
২৮. N. A. Razvi, *Op. cit.* p. 105.

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ রেলওয়ে পুলিশ

ভারতীয় উপমহাদেশে রেলওয়ে পুলিশের উল্লেখ আছে এ্যাক্ট ৫, ১৯৬১ সালের আইনে। এই বিধি মোতাবেক রেলওয়ে পুলিশ গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয় ১৮৬২ সালে। এর পরে লেঃ গভর্নরের নির্দেশে ১৮৬৬ সালে রেলওয়ে পুলিশ গঠন করা হয়।[২৯] পরে বিদ্যমান রেলওয়ে পুলিশ সম্পর্কে ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টে কিছু সুপারিশ করা হয়। কমিশনের সুপারিশে রেলওয়ে পুলিশকে জিলা পুলিশ সংগঠনের অনুরূপ সংগঠিত করার কথা বলা হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রেলওয়ে পুলিশের এখতিয়ারের সীমা হবে একই প্রদেশের সীমানার মধ্যে। প্রত্যেক প্রদেশে আলাদা রেলওয়ে প্রশাসনের অধীন স্বতন্ত্র জিলা রেলওয়ে প্রশাসন গড়ে ওঠে। রেলওয়ে পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমিত রাখা হয়, ফলে Watch and Ward-এর দায়িত্ব সম্পর্কিত সুপারিশ বাদ দেয়া হয়।

রেলওয়ে পুলিশ ও জিলা পুলিশের মধ্যে সম্পর্ক হবে সহযোগিতামূলক। তবে ১৮৬৬ সালে রেলওয়ে পুলিশের দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ

রেলওয়ে প্লাটফর্মের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা।

রেলওয়ে এ্যাক্টের অধীন বিশেষ বিধান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা।

অভ্যন্তরীণ ও বিশেষ সেবা প্রদান যা কোন আইনের অধীন নয়।[৩০]

রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে থেকে যাত্রীদের কোন হারানো মালামাল সম্পর্কে তদন্ত করবে না।

১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ার ফলে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ভলান্টিয়ার রাইফেলস গঠিত হয়। এরপরে বেঙ্গল রেলওয়ে পুলিশ দুটি অংশে ভাগ করা হয়, যথা– Eastern Bengal Railway (Sealdah Section), অপরটি Eastern Bengal Railway (Saidpur Section)।

---

২৯. Government of Bengal, *Report of the Railway Police Committee 1908*, Political Department, Police Branch, p. 5.

৩০. *Ibid*, p.5.

Dhaka University Institutional Repository

রেলওয়ে পুলিশ সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় CID বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীনে এ বাহিনী ন্যস্ত করা হয়। তিনি প্রতিবছরে রেলওয়ে পুলিশ স্থাপনা সমূহ একবার পরিদর্শন করতেন এবং CID-এর বিভাগীয় দায়িত্বে নিয়োজিত একজন পুলিশ সুপার প্রতি দুই বছরে একটি রেলওয়ে সার্কেল পরিদর্শন করতেন। রেলওয়ে পুলিশ সর্বদাই জিলা পুলিশের সহযোগিতায় কাজ করতো। বেঙ্গল, বিহার ও উড়িষ্যার রেলওয়ে পুলিশের সার্বিক জনবল ১৯১৬ সালে ছিল নিম্নরূপ ঃ[৩১]

ইন্সপেক্টর — ৬ জন ,সাব-ইন্সপেক্টর — ২৮ জন,
সার্জেন্ট — ১০ জন, হেড-কনস্টেবল — ৪৩ জন এবং
কনস্টেবল — ২১১ জন।

পুলিশ কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী রেলওয়ে পুলিশ কার্যক্রম চলতে থাকে যদিও সাংগঠনিক জনবল মাঝে মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামোর তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে অপরাধ নির্ধারণের খতিয়ান নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলো ঃ

সারণি-৫

১৯১২ ও ১৯১৩ সালে রেলওয়ে পুলিশ বিভাগে অপরাধ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা সংখ্যা

রেলওয়ে	প্রকৃত মামলা সংখ্যা		সিদ্ধান্তকৃত মামলা সংখ্যা		দোষী সাব্যস্তকরণ মামলা সংখ্যা	
	১৯১২	১৯১৩	১৯১২	১৯১৩	১৯১২	১৯১৩
ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া রেলওয়ে	৩৮১৬	৩২৮১	৬৭১	৮৩৮	৬০৩	৭৬৬
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (শিয়ালদহ বিভাগ)	১৪৮৩	১২৮৪	৭৭৬	৫১৪	৭২২	৪৫১
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (সৈয়দপুর বিভাগ)	১০৭১	১০৩৭	১৬৭	৩৪২	১৪২	২৯২
মোট	৬৩৭০	৫৬০২	১৬১৪	১৬৯৪	১৪৬৭	১৫০৭

উৎস ঃ *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year* 1913, p. 10.

৩১. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year*-1913, p. 10.

Dhaka University Institutional Repository

এই সারণিতে দেখা যায় যে, প্রকৃত মামলার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক মামলায় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সর্বশেষ দোষীসাব্যস্ত করা হয় আরো কম সংখ্যক মামলায়। মামলা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাদীদের অনুপস্থিতি ছিল এর মূলকারণ। একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায় পরবর্তী বছরগুলোতে। তবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত একই ধারা অব্যাহত ছিল– তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৬ সালের নিম্নোক্ত সারণি থেকে।

সারণি-৬

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে রেলওয়ে পুলিশ বিভাগে অপরাধ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা সংখ্যা

রেলওয়ে	প্রকৃত কেস সংখ্যা		সিদ্ধান্তকৃত কেসসমূহ		দোষী সাব্যস্তকৃত কেসসমূহ	
	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৬	১৯৩৭
ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া রেলওয়ে	১১৫৫	১৪৫৩	৫৩৪	৮৩২	৫১৫	৮১০
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (শিয়ালদহ বিভাগ)	৬৪৩	৬৪০	৩৫২	২৮০	৩২৫	২৬২
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এবং আসাম রেলওয়ে (সৈয়দপুর বিভাগ)	৬৩৫	৬০৬	২৫৪	২৫০	২৩৩	২২০
মোট	২৪৩৩	২৬৯৯	১১৪০	১৩৬২	১০৭৩	১২৯২

উৎস ঃ Government of Bengal, *Report on the Police Administration of Bengal Presidency for the year* 1936, p.7.

এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সালে প্রকৃত কেস সংখ্যা ছিল ২৪৩৩টি যার মধ্যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় ১১৪০টি কেসের এবং পরিশেষে দোষী সাব্যস্তকৃত কেস সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭৩টি।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল এবং কার্যক্রমও একই ধারায় অব্যাহত ছিল। তবে ১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব বাংলায় রেলওয়ে পুলিশকে একটি রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করে দায়িত্ব দেয়া হয় একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের উপর। এর রেঞ্জকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে সৈয়দপুরে এবং যমুনা নদীর পূর্ব তীরের সমগ্র অঞ্চল নিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়।[৩২]

৩২. N. A. Razvi, *Op. cit.* p.110.

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID)

১৮৭৮ সালে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ শাখার জন্য প্রথম (Criminal Investigation Department-CID) নাম ব্যবহৃত হয়। জিজ্ঞাসাবাদ, অনুসন্ধান এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের তথ্যাদি উদ্‌ঘাটন করা ছিল এই বিভাগের কাজ।[৩৩]

প্রকৃতপক্ষে এদেশে তদন্ত বিভাগ অপেক্ষাকৃত পরে সৃষ্টি। তবে এর পূর্বে ভারতে ডাকাতি ও খুন জাতীয় অপরাধ বৃদ্ধি পেলে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৮৩০ সালে "ঠগী ও ডাকাতি" বিভাগ চালু করা হয়। কিন্তু এর কার্যক্রম বেশি দূর এগোয়নি। ১৮৩৫ সালে Sleeman এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি শুধু ঠগীদেরই উচ্ছেদ করেন নি, ডাকাতদের বিরুদ্ধেও কড়া অভিযান পরিচালনা করেন। তা সত্ত্বেও ১৮৬০ সালে এই বিভাগটি বিলোপ করা হয়।[৩৪] এই বিলুপ্তির পিছনে কারণ ছিল সম্ভবত আইন শৃঙ্খলায় উন্নতি এবং ১৮৬১ সালে নতুন পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি। ফলে ঠগী ও ডাকাতি বিভাগটি তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই বিভাগ সৃষ্টি করা হয় ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশনের সুপারিশের আলোকে। এতে প্রত্যেক প্রদেশে একটি অপরাধ তদন্ত বিভাগ স্থাপনের কথা বলা হয়। উক্ত বিভাগের কাজ হবে সংঘটিত অপরাধের পূর্বাপর তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অপরাধ তদন্তে সহায়তা করা। প্রদেশের তদন্ত বিভাগের প্রধান হবেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদের একজন অফিসার যার ওপর প্রাথমিকভাবে রেলওয়ে পুলিশের দায়িত্বও ছিল। তার ব্যক্তিগত সহকারি হিসেবে একজন জিলা সুপারিনটেনডেন্ট থাকবে। কেন্দ্রীয়ভাবে অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রধান হিসেবে ইন্সপেক্টর জেনারেল পদের একজন থাকবেন। এক জেলায় কর্তব্যরত একজন পুলিশ সুপরিনটেনডেন্ট অপর জেলার অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী জেলায় অপরাধ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নাও থাকতে পারেন। তাই এই বিভাগ গঠন করে গোয়েন্দা অফিসার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়। কমিশন প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয়ভাবে অপরাধ তদন্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রাদেশিক অপরাধ বিভাগের সাথে পারস্পরিক আন্তঃ যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৩৫]

---

৩৩. *Ibid*, p.110.

৩৪. A.B.M.G. Kibria, *Op, cit*. p. 41.

৩৫. *Report of the Indian Police Commission 1902-03*, pp. (141—142)

Dhaka University Institutional Repository

১৯০২-০৩ সালের কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হতে বেশ সময় লাগে। ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবে, ১৯১০ সালে বোম্বে, সিন্ধুতে ১৯১১ সালে CID বা অপরাধ তদন্ত বিভাগ সৃষ্টি করা হয় আর কলকাতাতে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯১০ সালে।[৩৬] ১৯০৪ সালে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট গঠিত হয়। এই বিভাগ গঠন করে কেন্দ্রে একজন পরিচালক নিয়োগ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে এর শাখা খোলা হয় যার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয় একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এই শাখাকে কতকগুলো রেঞ্জে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক রেঞ্জের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় একজন পুলিশ সুপারকে। রেঞ্জের সদর দপ্তরে একজন সহকারি পুলিশ সুপার ও অল্প কিছু সহকারি পুলিশ সদস্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এই বিভাগের মূল কাজ ছিল স্থল, নৌ ও রেলপথে ডাকাতির তদন্ত করা, মুদ্রা, স্ট্যাম্প ও নোট জালিয়াতির অনুসন্ধান করা, খুন ও ডাকাতি ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অনুসন্ধান করা। ১৯১০ সালে Criminal Intelligence Branch-কে কেন্দ্রীয় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে একত্রিত করা হয়। তারপরেও এ শাখাটি Criminal Intelligence Bureau (CIB) নামে পরিচিত ছিল। CID এর সাথে সংযুক্তির ফলে এ শাখার কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পায়। যেমন–

i) বিশেষ শ্রেণীভুক্ত অপরাধ ও পেশাদার অপরাধীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করা।

ii) তদন্তকারি কর্মকর্তা ও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

iii) অপরাধ করার পর পলাতক অপরাধী পরিচিতি সংগ্রহ করে তার সনাক্তকরণ কর্মকে ত্বরান্বিত করা বা অপরাধীকে খুঁজে বের করা।

iv) সংঘটিত অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর চরিত্র বিশ্লেষণ ও অপরাধের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে তা নথিভুক্ত করা।

v) এছাড়া, পেশাদার অপরাধীদের জীবন বৃত্তান্তসহ ভিন্ন ভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করে অপরাধীদের শ্রেণীবিন্যাস করা এবং তদন্ত কার্যের সাহায্য তথ্য সরবরাহ করা।[৩৭] ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ মত রেলওয়ে পুলিশ ও সি আই ডি'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় সি. আই. ডি'র সদর দপ্তর হয় বুড়িগঙ্গার তীরে ওয়াইজ ঘাটে ঢাকার নবাবদের একটা পুরানো বাড়ীতে।

---

৩৬. N. A. Razvi, *Op. cit.* p. 110.

৩৭. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ, উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, পৃঃ (১০৮-১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০—১৯৪৭ সাল পর্যন্ত খুঁটি-নাটি বিষয়ের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বাদ দিলে অপরাধ তদন্ত বিভাগ প্রায় একই প্রকৃতি ও ধাঁচের ছিল। ১৯৪৭ সালের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সংগঠিত করা হয় এবং এর সাথে জটিল কেসের তদন্তকারি স্টাফ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো, ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরো এবং ফরেনসিক বিজ্ঞানাগার সংযুক্ত করা হয়।

২.৭ ট্রাফিক পুলিশ

বাংলাদেশে ট্রাফিক পুলিশ নামে শুরুতে পৃথক কোন বিভাগ ছিল না। এমন কি বর্তমানেও ট্রাফিক পুলিশ আই. জি. পি'র অধীন পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সমন্বয়ে গঠিত অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি অংগ সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। এই বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে শহরের স্থলপথের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা। ভারতীয় উপমহাদেশে ট্রাফিক পুলিশের প্রবর্তন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। ১৯০৪ সালে CID পুলিশ শহরের যানবাহনের ওপর নজরদারি করতো। এই সময় যানবাহন কম থাকায় তাদের দায়িত্বও কম ছিল।

১৯৩৭ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জে বিশেষ ট্রাফিক পুলিশ কাজ করে। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লীতে এ বছর এক বৈঠক হয় এবং এ বৈঠকে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।[৩৮]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মটরযান ও আধুনিক যানযাহন কম থাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু আধুনিক যানবাহনের বৃদ্ধির ফলে নগর জীবনের রাস্তাঘাটের ব্যস্ততাও বৃদ্ধি পায়। ফলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয় ট্রাফিক পুলিশ। তাই ১৯৪০ সালে শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক বৃদ্ধির দাবি ওঠে।

৩৮. *Report on the Police Administration of the Bengal Presidency for the year* 1938, p.6.

Dhaka University Institutional Repository

There is an urgent need for the sanction of additional staff for traffic police duties. In particular, the new rules under the Motor Vehicles Act require close and constant attention on behalf of the police in order to ensure their full and impartial enforcement. There is in this district a particular need for the enforcement of these rules in regard to goods traffic, but I see little hope of this being adequately done unless some additional staff can be provided.[৩৯]

উপরোক্ত বক্তব্যে তৎকালিন ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পরবর্তীকালে জিলা সদরে পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণে একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্টের তত্ত্বাবধানে জেলা ট্রাফিক পুলিশ কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর বড় শহরে একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে মহানগর ট্রাফিক পুলিশ পরিচালিত হয়।

২.৮ মিউনিসিপ্যাল ও ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ

মিউনিসিপ্যালিটির জন্য পৃথক কোন পুলিশ ফোর্সের প্রয়োজন নাই বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। বিশেষ করে যেখানে তাদের বেতন ভাতাদি মিউনিসিপ্যাল ও ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হয় এবং তাদের বেতন ভাতাদি প্রাদেশিক রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। মিউনিসিপ্যাল পুলিশের ব্যয় দিয়ে মিউনিসিপ্যাল তার অধীনের অন্যান্য কাজ ভালভাবে চালাতে পারবে। মিউনিসিপ্যাল ও ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ একই প্রকৃতির হবে এবং উভয় পুলিশ প্রাদেশিক পুলিশের অংশ হিসেবে থাকবে।

এই সুপারিশ সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তবে বাংলায় মিউনিসিপ্যাল পুলিশ এর পরিবর্তে কলকাতার পূর্ব থেকে পৃথক পুলিশ বা কলকাতা পুলিশ নিজস্ব প্রশাসনে পরিচালিত হচ্ছিল। এই ব্যবস্থা ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

২.৯ মিলিটারি পুলিশ

১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে মিলিটারি পুলিশকে আলাদা পুলিশ বিভাগ হিসেবে না রাখার কথা বলা হয়। কারণ মিলিটারি পুলিশ কদাচিৎ নিয়োজিত থাকে আইন শৃঙ্খলার কাজে। তাই আর্মড রিজার্ভ ফোর্সের সাথে মিলিটারি পুলিশকে যুক্ত করার কথা বলা হয়।[৪০] বাংলায় চারটি মিলিটারি পুলিশের কোম্পানী বিশেষ আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয় যাদের স্টেশন ছিল ঢাকা, হুগলি, ভাগলপুর ও ভুমকা নামক স্থানে।

৩৯. *Report on the Police Administration of the Province of Bengal Presidency for the year* 1940, p.3. (Statement of the District Magistrate of 24 Pargana)
৪০. *Report of the Indian Police Commission* 1902-03, Para-73

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে মিলিটারি পুলিশ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সচিব ১৯০৬ সালে ২৫ অক্টোবর ৩৮২ নং ডেচপাচে উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যতে মিলিটারি পুলিশকে Special Reserve ফোর্স বলা হবে। তবে, তিনি এর জন্য Bengal Military Police Act সংশোধন করার জোর দেন।[৪১] কিন্তু মিলিটারি পুলিশ শিরোনামে এই বাহিনী তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। মিলিটারি পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন পদবীর সদস্য সংখ্যা মাঝে মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ সালে মিলিটারি পুলিশের চারটি কোম্পানীর সাথে আরো দুটি নতুন বরাদ্ধ করা হয় এবং একজন অতিরিক্ত এসিসটেন্ট কম্যান্ডডেন্ট বৃদ্ধি করা হয়।[৪২]

এভাবে মিলিটারি পুলিশ একটি পূর্ণ সংগঠনের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গীয় প্রদেশের প্রশাসন প্রতিবেদনে মিলিটারি পুলিশের কার্যাবলী সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১৯১৮—১৯ সালের বঙ্গীয় প্রদেশের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রাদেশিক ব্রিগেড কমান্ডিং অফিসার মিলিটারি পুলিশের ব্যাটেলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং ড্রিল ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৪৩] মিলিটারি পুলিশের কাজ সার্বিক বিচারে বেশ ছিল। কেননা তাদেরকে আর্মড রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কোথাও কোন দাঙ্গা জাতীয় সমস্যা দেখা দিলে মিলিটারি পুলিশের জন্য তলব করা হত। তবে, ১৯২০-২১ সালে পুলিশ প্রশাসন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৯২০ সালের পরে মিলিটারি পুলিশ Eastern Frontier Rifles (Bengal Battalion) নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সময় এই ফোর্স পূর্ণাঙ্গ না হয়েও শৃঙ্খলিত অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।[৪৪] এই বাহিনী নাম পরিবর্তনের পর স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। এ বছর মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার দাঙ্গা দমনে এই ফোর্স দক্ষতার সাক্ষ্য রাখে। ১৯২১ সালে নিয়োজিত মিলিটারি পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল নিম্নে দেয়া হলো।[৪৫]

---

৪১. *Report on the Police Administration of the Lower Provinces*, Bengal Presidency for the year 1906. p. 8.
৪২. *Report on the Police Administration of the Bengal Presidency* for the year 1914. p.1.
৪৩. *Report on the Administration of Bengal* 1918—19. Para-71.
৪৪. *Report on the Administration of Bengal*, 1920-21, Para-74.
৪৫. *A Statement of the strength of the Police Force in Bengal and of certain pending schemes* 1921, p. 105.

Dhaka University Institutional Repository

ইস্টার্ণ ফরেন্টিয়ার রাইফেলস

কম্যান্ডডেন্ট	১ জন	সুপিরিয়র স্টাফ
সহকারি কম্যান্ডডেন্ট	৩ ,,	
মোট সুপিরিয়ার স্টাফ	৪ ,,	
সুবেদার	৮ ,,	ইনফেরিয়র স্টাফ
জমাদার	৮ ,,	
হাবিলদার	৭০ ,,	
সিপাহী	৭৩৯,,	
বাগলারস	১৪ ,,	
মোট ইনফেরিয়র স্টাফ	৮৩৯,,	

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মিলিটারি পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় একই প্রকৃতির ছিল। সুপিরিয়র স্টাফদের মধ্যে কম্যান্ডডেন্ট ও সহকারি কম্যান্ডডেন্ট এর অধীনে এই বাহিনী পরিচালিত হয়। আসলে সাংগঠনিক জনশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি এই মিলিটারি পুলিশের ক্ষেত্রে। তবে পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীর মধ্যে মিলিটারি পুলিশ (MP) একটা ইউনিট হিসেবে থাকে।

২.১০ গ্রাম্য পুলিশ

প্রাচীন গ্রাম্য শাসনব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। আর এই গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা মূলত Village Watch-এর সমরূপ ব্যবস্থা।[৪৬] জমিদারদের পুলিশী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রহিত হবার পর Village Watch-গণ প্রজায় পরিণত হয়। তবে, জমিদারগণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রাখতেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন ছিল না। পরে সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৮৬৯ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম্য পুলিশের সংস্কার করা ও তাদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা। অবশেষে এই কমিটির সুপারিশ ১৮৭০ সালের এ্যাক্ট VI নামে পাশ হয়।

৪৬. *Report of the Indian Police Commission* 1902-03, Para-43.

Dhaka University Institutional Repository

এ বিধিতে গ্রাম্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রাম্য সমাজের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তাছাড়া, আশা করা হয়েছিল যে, গ্রাম্য সমাজে অপরাধীকে চিহ্নিত করে পুলিশকে সহায়তা করার মত সচেতনতা গড়ে ওঠবে। কিন্তু বাস্তব কার্যক্রমে তা না হওয়ায় ১৮৮১ সালে তৎকালিন পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল মুনরো এই বিষয়ের ওপর একটি কমিশন গঠনের পরামর্শ দেন। ১৮৮৩ সালে গঠিত কমিশনের নির্দিষ্ট কিছু সংশোধনীসহ সুপারিশ ১৮৯২ সালের এ্যাক্ট ১, হিসেবে তা অনুমোদিত হয়। এই আইনের প্রবর্তক ছিলেন হেনরি কটন। এই এ্যাক্টের মাধ্যমে ১৮৭০ সালের প্রণীত বিধিকে সংশোধন করে গ্রাম্য পুলিশের ওপর থেকে গ্রাম্য সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনে গ্রামবাসীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়।[৪৭] এছাড়া পঞ্চায়েত কর্তৃক চৌকিদাররা মনোনীত হলেও চৌকিদারদের নিয়োগ, তাদের সংখ্যা নির্ধারণ ও বেতনাদির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। কর্তব্য কর্মে গাফিলতির জন্য চৌকিদারের জন্য ও শাস্তির বিধান ছিল। সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এই শাস্তি দেয়া হত। গ্রাম্য পুলিশ ও নিয়মিত পুলিশদের সম্পর্ক এসময় জোরদার হয়। প্রতি ১০ থেকে ২০ জন চৌকিদারদের তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য একজন দফাদার নিয়োগ করা হয়।

এই প্রথাও কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। পরে ১৮৯১ সালে বীমকে সভাপতি করে বাংলার গ্রাম্য পুলিশ উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি কিছু সুপারিশ পেশ করলেও ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে গ্রাম্য পুলিশ সম্পর্কে স্পষ্ট সুপারিশ রাখা হয়। এই সুপারিশে গ্রাম্য পুলিশকে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। গ্রাম্য পুলিশের দায়িত্বের কথা বলা হয় যে, তারা হবে গ্রামের সেবক। এই গ্রাম্য পুলিশ গ্রাম প্রধানের অধীনে হলেও নিয়মিত পুলিশের অধীন নয়। আর গ্রাম প্রধানদের তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনারের ওপর অর্পনের কথা বলা হয়। এছাড়া গ্রাম্য পুলিশদের নিয়মিতভাবে পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হওয়াকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্চিত বলে বিবেচিত হয়।[৪৮] কমিশন রিপোর্ট সুপারিশে যেসব অঞ্চলে গ্রাম্য পুলিশ পদ্ধতি প্রচলিত নেই সেখানে ইহা প্রচলনের পরামর্শ দেয়া হয়।

---

৪৭. *Ibid.* Para-43.
৪৮. *I bid.* Para-44.

Dhaka University Institutional Repository

ভারত সরকার গ্রাম্য পুলিশ সংক্রান্ত সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে স্থানীয় সরকারকে গ্রাম্য অপরাধ দমনে দক্ষ এজেন্সি হিসেবে গ্রাম্য পুলিশকে কাজে লাগাতে আহ্বান জানায়। ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের গ্রাম্য পুলিশ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য H. Savage-কে ১৯০৪ সালে কিছু বিষয়াদি পর্যাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। সার্বিকভাবে তিনি চৌকিদার ম্যানুয়েল সম্পাদন করেন। অবশ্য ১৯০৫ সালের দিকে Wheeler এই চৌকিদার ম্যানুয়েল বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। তা বাস্তবায়নের জন্য ১৯০৭ সালে স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪৯] ফলে চৌকিদারগণ অপরাধ দমনে পুলিশকে সহায়তাদান, পুলিশের আদেশ পালন, অপরাধীকে খুঁজে বের করতে সহায়তা করে। পঞ্চায়েত চৌকিদারি ট্যাক্স আদায় ও চৌকিদারদের বেতন নিয়মিত পরিশোধকরণের এজেন্সি হিসেবে বিবেচিত হয়। এরপরে গ্রাম্য পুলিশকে উন্নয়নের জন্য কিছু কমিটি গঠিত হলেও তা কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

১৯০২-০৩ সালের কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রাম্য পুলিশের সাংগঠনিক কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ১৯১২ সালে চৌকিদার ও দফাদার সংখ্যা ছিল ৮৭,৬০৯ জন এবং ১৯১১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৮৬,৩৫৭ জন। ১৯১২ সালে কিছু ইউনিয়ন এর সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারের পর চৌকিদার ও দফাদার বৃদ্ধি করা হয়। তা ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সময়ের চাহিদার সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের জন্যও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯১২ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া, হুগলি জেলার পুলিশ সুপারগণ চৌকিদারদের কার্যাবলীর প্রশংসা করেন। পাশাপাশি রাজশাহীর পুলিশ সুপার ৩৩ জন চৌকিদারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এছাড়া, বরিশালের পুলিশ সুপারও গ্রাম্য পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন।[৫০] গ্রাম্য পুলিশ সংক্রান্ত কার্যাবলী ১৯০২ সালের কমিশন সুপারিশ মত বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেও ১৯১৯ সালে গ্রাম্য স্বায়ত্ত্বশাসন বিধি প্রবর্তিত হয়। ফলে গ্রাম্য পুলিশদের নিয়োগ এই বিধিমত শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের পুলিশ প্রশাসন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই সময় চৌকিদার ও দফাদারের সংখ্যা ছিল ৭৪,৪৮৪ জন।

৪৯. W. R. Gourlary, *Op. cit.* p. 112.
৫০. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency* for the year 1912, p. 22.

Dhaka University Institutional Repository

(১) গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯ অনুযায়ী ৫৭,৯৬৬ জন
(২) ১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকিদার আইন অনুযায়ী ১৫,৮৩৯ জন
(৩) চাকারণ পদ্ধতি অনুযায়ী ৫০৩ জন
(৪) ১৮১৮ সালের রেগুলেশন III অনুযায়ী১৭৬ জন।[৫১]

পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩ এর রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গ্রাম্য পুলিশকে নিয়মিত পুলিশের অধীন আনা হয়নি এবং এ ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গ্রাম্য পুলিশের সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে মাঝে মধ্যে—তবে তাদের কার্যাবলী পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

২.১১ উপসংহার

পরবর্তীকালে পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও প্রশাসনিক স্তর মূলত ১৯০২-০৩ সালের আলোচ্য কমিশন সুপারিশের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। তবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুলিশ সংগঠনের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। কমিশন সুপারিশে পুলিশ সংগঠনকে অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় বিভক্ত করার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করা হয় এবং তা ১৯১২ সাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়। কিন্তু ১৯১২ সালের পরে আবার অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় বিভক্ত করা হয়। মিলিটারি পুলিশ বিলোপের কথা কমিশন সুপারিশে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা বিদ্যমান ছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে পুলিশের বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। পুলিশের বিশেষ সংগঠন সমূহ যেমন, নৌ-পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, সি আই ডি পুলিশ এর কাঠামোগত আয়তন ও কলেবরে বৃদ্ধি পেতে থাকে সময়ের ধারাবাহিকতায়। গ্রাম্য পুলিশকে নিয়মিত পুলিশের অধীনে না রাখা হলেও গ্রাম্য আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষায় গ্রাম্য পুলিশ জোরালো ভূমিকা রাখে। গ্রাম্য পুলিশের ভূমিকা পরবর্তী পর্যায়েও অব্যাহত থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে পুলিশের বিভিন্ন সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হত নিয়মিত পুলিশের মাধ্যমে। অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনের সামগ্রিক চালিকা শক্তি ছিল নিয়মিত পুলিশ সংগঠন।

৫১. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency* for the year 1937, p. 14

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা ঃ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ হল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ। পুলিশ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের আদি অবস্থায় পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় না। ১৮২৯ সালে ইংল্যান্ডে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনেক পরে অর্থাৎ ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট ৫ এর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়। ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্টের মূল বক্তব্য ছিল–মিলিটারি পুলিশের পরিবর্তে আইরিশ কনস্টেবুলারি মডেল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে সিভিল পদ্ধতির পুলিশ প্রবর্তন করা, পুলিশকে বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে না রেখে স্বতন্ত্রভাবে পুলিশ বিভাগের অধীনে রাখা, আর প্রত্যেক প্রদেশের পুলিশ প্রধান হিসেবে থাকবেন একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, জিলা পর্যায়ে পুলিশ প্রধান হিসেবে থাকবেন একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, গ্রাম্য পুলিশের তদারকির দায়িত্ব থাকবে জিলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের ওপর।[১]

এছাড়া পুলিশের নানা মৌলিক নীতি ও বিধান ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট ৫, এর মাধ্যমে প্রণীত হয়। এ সময়ে পুলিশ নিয়োগের জন্য একটা নীতিমালা তৈরী হয়। যেমন নিয়োগের সময় ধর্ম, বর্ণ, জাতি বিবেচনার বাইরে রাখতে হবে, গ্রামীন কৃষক এবং আদালত চত্বরে যেসব বেকার যুবক ঘুরাফেরা করে তাদের, পূর্বেকার দারোগা, বরকন্দাজ ও সিপাহীদের মধ্যে যারা ভাল চরিত্রের অধিকারী তাদের এবং শিক্ষিত যুবক প্রভৃতি নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জিলা পুলিশ নিয়োগ জেলার লোকদের প্রাধান্য দিতে হবে।[২]

---

১. David. H. Bayley, *The Police & Political Development in India*, p. 47.

২. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, পৃ. (২২২-২২৩).

Dhaka University Institutional Repository

আসলে এই আইনে পুলিশ বিভাগের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের বিধান থাকলেও তা বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ফলে পুলিশ ব্যবস্থা কাঙ্খিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। এ অবস্থার আলোকে সার্বিক পরিস্থিতি ও পুলিশ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এমনি ধারাবাহিকতায় ফলস্বরূপ ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে পুলিশ কমিশন রিপোর্ট ১৯০২-০৩ এর নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের সুপারিশ ও তার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বলতে নিয়মিত পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশে পুলিশকে নিয়মিত পুলিশ ও স্পেশাল পুলিশ এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা-মিলিটারি পুলিশ, সিভিল পুলিশ ও গ্রাম্য পুলিশ। এক্ষেত্রে সিভিল পুলিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিয়মিত পুলিশ, নৌ পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ ও সি. আই. ডি পুলিশ। তাই পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম মূলতঃ সিভিল পুলিশের মধ্যে সীমিত ছিল। এ অধ্যায়ে প্রথমে ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ এবং পরে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ ১৯০২-০৩ সালের পুলিশ কমিশন রিপোর্টের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ

৩.১.১ কনস্টেবল নিয়োগ

এই কমিশন সমগ্র ভারত-উপমহাদেশের পুলিশের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে বিভিন্ন সুপারিশ করে যা বাংলার জন্যও প্রয়োজ্য ছিল। পুলিশ কমিশন জিলা থেকে একচেটিয়া কনস্টেবল নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। অবশ্য এ ব্যাপারে অফিসারদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। কারণ কিছু সংখ্যক অফিসার জিলা থেকে অল্প সংখ্যক কনস্টেবল নিয়োগের পক্ষে, আর কিছু সংখ্যক অফিসার এক্সচেটিয়া জিলা থেকে নিয়োগের পক্ষে মত প্রদান করে। তবে পুলিশ কমিশন জিলা থেকে এক্সচেটিয়া নিয়োগকে সমর্থন করলেও কিছু জরুরি ক্ষেত্রে বিদেশীদের নিয়োগ দেয়া হয়। আর এই অবস্থা তখনই ঘটে, যখন স্থানীয়দেরকে শারীরিকভাবে অযোগ্য অথবা পুলিশী-দায়িত্ব পালনে অপারগ বিবেচিত হয়।

১৯০২ সনে পুলিশ কমিশনের বক্তব্যে স্থানীয়ভাবে নিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়। যাতে পুলিশ জনসাধারণকে অনুধাবন করতে পারে। এছাড়া স্থানীয় মতামতের জন্য কনস্টেবলদের স্থানীয় ভাষা ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কনস্টেবলদের দায়িত্বের আলোকে তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। সমাজের সম্মানিত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যাদের পারিবারিক ইতিহাস মূল্যায়নে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় তাদেরকে পুলিশ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর অপরাধ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়। দায়িত্ব পালনে সক্ষম এরূপ শারীরিক যোগ্যতাসহ প্রত্যেক কনস্টেবলকে অবশ্যই লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতে হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক যোগ্যতাকে শিক্ষার চেয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুপারিশে উচ্চতা নির্ধারণের পরিবর্তে শারীরিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মানান-সই উচ্চতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৩]

হেড কনস্টেবলদের সরাসরি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় নি। কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া হেড কনস্টেবলদের শূন্যপদ কনস্টেবলদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণ করার বিধান করা হয়। কেবল দক্ষ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারি কনস্টেবলদের পদোন্নতির মাধ্যমে হেড কনস্টেবলদের পদপূরণ করা হয়।

৩. *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, Para-54.

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.২ কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ

যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কনস্টেবলদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। যদিও ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। পুলিশদের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার জন্য অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। আসলে পূর্বে জিলা পর্যায়ের হেড-কোয়ার্টার বা জিলা পর্যায়ের স্কুলে পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এই পর্যায়ে জিলা সুপারিন্টেনডেন্ট এর মাধ্যমে কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হয়। কারণ জিলা পর্যায়ের মাধ্যমে কনস্টেবলগণ সহজে প্রশিক্ষণ পাবেন। কিন্তু এই বক্তব্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুপারিনটেনডেন্ট অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রশিক্ষণ কাজে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। আর তাই প্রশিক্ষণ কাজের তত্ত্বাবধায়ন করতেন হেড কনস্টেবল বা একজন সাব ইন্সপেক্টর। অথচ তারা এই প্রশিক্ষণ কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না।

তাই কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হয়। কয়েকটি জিলায় সমন্বয়ে একই বিভাগের অধীন এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এতে প্রশাসনিক সুবিধাসহ একই ভাষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর। প্রশিক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ ছিল ঃ ১) ড্রিল, ২) প্রাথমিক আইন ও পদ্ধতি, ৩) পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত, ৪) পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির আচরণ ইত্যাদি।[৪] প্রশিক্ষণ কোর্স ৬ মাসের অধিক এবং প্রশ্নোত্তর প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রদেশে আইন ও পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শরীর চর্চা সকল প্রদেশের কনস্টেবলদের একই প্রকৃতির ছিল এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একটা সাধারণ টেক্সট বুক সুপারিশ করা হয়।

প্রত্যেক প্রশিক্ষণ স্কুলে অধ্যক্ষের পদ পূরণ করার জন্য সহকারী বা ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদের একজনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ড্রিল নির্দেশনার দায়িত্বে একজন ইন্সপেক্টর এবং তাকে সহায়তা করার জন্য একজন হেড কনস্টেবল ও একজন সহকারি ড্রিল ইন্সট্রাক্টর থাকার বিধান রাখা হয়। অবশ্য তা প্রতি চল্লিশ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্রযোজ্য হবে। আইন ও পদ্ধতি প্রশিক্ষণের জন্য একজন ইন্সপেক্টরকে প্রধান ইনস্ট্রাক্টর এবং তাকে একজন সাব-ইন্সপেক্টর সাহায্য করেন। সেইসাথে প্রশিক্ষণার্থী কনস্টেবলদের জন্য আবাসস্থল বা ব্যারাক, ক্লাশরুম, শরীরচর্চা কেন্দ্র, রান্নাঘরসহ সার্বিক ভৌত সুবিধাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

---

৪. *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, appendix III. p. 165.

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৩ সাব-ইন্সপেক্টরদের নিয়োগ

কমিশন প্রতিবেদনে সাব-ইন্সপেক্টরদের সরাসরি নিয়োগের বিধান রাখা হয়। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের পর তদন্তকারি অফিসার হিসেবে নিয়োগ দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাব-ইন্সপেক্টরদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণ করা হয় সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ২৫ বছর। আর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদেশ অনুযায়ী হেরফের করা হলেও বাংলার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন বা চূড়ান্ত স্কুল পরীক্ষার নীচে হবে না বলে স্থির করা হয়। কমিশনার সরাসরিভাবে সাব-ইন্সপেক্টরদের নিয়োগ দানের জন্য জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর সহায়তায় প্রার্থী নির্বাচনের তালিকা প্রস্তুত করবেন। কমিশনার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে হতে চূড়ান্ত নামের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং নির্বাচিতদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যাচাই করার ব্যবস্থা নেবেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর স্কুল বা কলেজ প্রধানের নিকট হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। সাব ইন্সপেক্টরদের সরাসরি নিয়োগ দানের সুপারিশ করা হলেও পদোন্নতির মাধ্যমে হেড-কনস্টেবল পদ থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করার বিষয়টিকে একেবারে বন্ধ করা হয় নি। তবে এ সংখ্যা কোনভাবেই শতকরা পনের-এর বেশী হবে না।[৫]

৩.১.৪ সাব-ইন্সপেক্টর প্রশিক্ষণ

পুলিশ দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হচ্ছিল মূলতঃ অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ প্রশিক্ষণের জন্য। তাই কমিশনের সুপারিশে প্রত্যেকে প্রদেশে সাব-ইন্সপেক্টর ও তার উপরের পদের অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য সুসজ্জিত প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। অতএব, বাংলা প্রদেশের জন্য ও একই সুপারিশ প্রযোজ্য ছিল। সাব-ইন্সপেক্টরদের জন্য প্রবেশনারী প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-পুলিশ আইন, ভারতীয় দন্ডবিধি, সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইন, অপরাধ আইন এবং এর

---

৫. *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, Para-58.

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সংশ্লিষ্ট পুলিশী গ্রেফতার, তদন্ত ও তল্লাশি প্রক্রিয়ার বিধান ছাড়াও প্রাদেশিক পুলিশ আইনের স্থানীয় ও বিশেষ বিধানসমূহ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স এর উপাদান (Elements of Medical Jurisprudence), সাক্ষী সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অপরাধী চক্র সম্পর্কে নির্দেশনা, পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের প্রকৃতি, আঙ্গুলির ছাপ গ্রহণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ড্রিল বা শারীরিক কুচকাওয়াজ, ফায়ারিং ও বেয়োনেট চালানোর প্রশিক্ষণকে অপরিহার্য হিসেবে রাখা হয়। এছাড়াও কিছু ব্যবহারিক কাজ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মামলার প্রাথমিক নথি রেকর্ড পদ্ধতি, ডায়েরি ও রিপোর্ট তৈরীসহ ষ্টেশন অফিসার হিসেবে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন, টাউনের দায়িত্ব ও আটকাদেশের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন ছিল প্রশিক্ষণের অংশ।[৬]

৩.১.৫ ইউরোপীয় অফিসারদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

ইউরোপীয় সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অর্থাৎ ইংল্যান্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সাফল্যজনক ছিল। তাই, কমিশনও ইউরোপীয় সার্ভিসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যথা ঃ

১। তৎকালিন প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার নিয়োগ;

২। যে সকল প্রার্থী স্কুল শিক্ষায় ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা;

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণদের ইংল্যান্ডে বিশেষ প্রশিক্ষণের বিধান রাখা হয়। উদ্দেশ্য তাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যর উৎকর্ষ সাধন। নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বয়স নির্ধারিত ছিল সর্বনিম্ন ১৯ এবং সর্বোচ্চ ২১ বছর। আর ১৯০২-০৩ সনের পুলিশ কমিশন এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করে ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ২১ বছর, যাতে স্কুল শিক্ষা শেষ করা প্রার্থী পাওয়া যায়।

৬. *Report of the Indian Police Commission*, 1902-03, appendix IV, p. 167.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ-প্রাপ্তদের ইংল্যাণ্ডের ইংরেজি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান-স্টাডিজ বোর্ডে প্রশিক্ষণের জন্য অবস্থানের বিধান করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয় অপরাধ আইন ও তার প্রয়োগ, ক্রিমিনাল কোর্টের মামলার নোট গ্রহণ পদ্ধতি, ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস, জাতিসত্তা ও ভূগোল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন।[৭] প্রশিক্ষণের মেয়াদ করা হয় দুই বছর। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তার প্রশিক্ষণ কোর্স সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করার পর সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের সময় কঠোরতাও আরোপ করা হয়। দুই বছর প্রশিক্ষণকালীন ভাতা ছিল প্রতি বছরের জন্য ২০০ পাউন্ড। আর কোন প্রার্থী প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যর্থ হলে তার ভাতা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোন প্রশিক্ষণার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করতে চাইলে তার জ্যেষ্ঠতার কোন ক্ষতি ছাড়াই এক বছরের জন্য বিনা ভাতায় অধ্যয়নের অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। ভারতীয় ভাষা ও পরিবেশ অনুধাবনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভারতীয় প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ স্কুলে এক সেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে প্রশিক্ষণ পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন করার পর সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিয়োগদান করা হত। একজন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট সাত বছর কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের পর তাকে সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিয়োগ দানের জন্য বিবেচনা করা হতো। এইভাবে নিয়োগদানের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য অফিসার নিয়োগদান সহজ হয়।

---

৭. *Report of the Indian Police Commission* 1902-03, Para-64.

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৬ স্থানীয় অফিসারদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

যোগ্য ইন্সপেক্টরদের পদোন্নতির মাধ্যমে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বা সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের শূন্যপদের অর্ধেক সংখ্যক পদ পূরণ করার বিধান রাখা হয়। এটি অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে সাব-ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্টরদের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আর বাকী অর্ধেক শূন্য পদ পূরণ করার বিধান করা হয় ভারতীয়দের বা স্থানীয়দের দ্বারা যারা প্রাদেশিক সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব বা বিচার বা পুলিশ বিভাগে চাকুরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাদের জন্য শারীরিক ও নৈতিকভাবে যোগ্য হওয়া নিয়োগের শর্তের অংশ ছিল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ যদি ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তার পুলিশী অভিজ্ঞতা না থাকে তবে, তার জন্য প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিধান আবশ্যিক ছিল।

পুলিশ বিভাগের উচ্চপদে ও জিলা সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগ্য অফিসার নিয়োগদানের জন্য ইউরোপীয় সহকারি নিয়োগ করা হয়। সুপারিনটেনডেন্টদের বাড়তি কাজের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এক বা একাধিক সহকারি প্রয়োজন পড়ে। তাই প্রাদেশিক সার্ভিসের মাধ্যমে ভারতীয়দের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বা সহকারি পদমর্যাদার সমান পদে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

৩.১.৭ ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট

ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ দানের জন্য কম-বেশী এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। খুব সতর্কতার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ভারতীয়দের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ দেয়ার বিধান করা হয়। এই পদে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ভারতীয় ডেপুটি-সুপারিনটেনডেন্টকে তার কাজের দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রাদেশিক সার্ভিসের অন্যান্য বিভাগের মত সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যাবলী সফলভাবে সম্পন্ন করতে হত। দেশীয় অফিসারদের জন্য সুপারিনটেনডেন্টের কিছু সংখ্যক পদ সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়। অবশ্য তার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৮ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও ইন্সপেক্টর জেনারেল

বেশ কয়েকটি জিলায় সমন্বয়ে পুলিশ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদ প্রয়োজন হয়। সুপারিনটেনডেন্টদের মধ্যে হতে সতর্কতায় সহিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলদের মনোনীত করা হতো। আর ইন্সপেক্টর জেনারেল পদ Act V, ১৮৬১ সালের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। ইহা পুলিশের একটি প্রদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ যা পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩.২ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩ এর নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা

১৯০২-০৩ সনের পুলিশ কমিশনের সুপারিশের আলোকে পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান পর্যন্ত ভারতীয় পুলিশ ব্যবস্থার সার্বিক দিক নির্দেশনা পরিচালিত হয় এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে। তবে, পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনে ১৯০২-০৩ সনের পুলিশ কমিশনের সুপারিশের বদ-বদল ও যোজন-বিয়োজন ঘটেছে। ১৯০২ সনে পুলিশ কমিশন গঠিত হবার পর পুলিশ প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার মিল ব্যারাকে ১৯০৬ সনে একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। পরে কমিশনের সুপারিশ মত প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারদায় ১৯১২ সালে ইহা স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাদেশিক সকল পুলিশ অফিসারদের সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ কাজের জন্য নির্বাচিত সুপারিনটেনডেন্টদের দ্বারা নব-নিয়োগকৃত সহকারি সুপারিনটেনডেন্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। আর কনস্টেবলদের জন্যও চারটি প্রশিক্ষণ স্কুল যথা সারদা, রামপুরা-বোয়ালিয়া, বারহামপুর এবং ঢাকায় স্থাপন করা হয়।[৮] ফলে পুলিশ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে চলতে থাকে।

---

৮. N.A. Razvi, *Op. cit.*, p. 127.

Dhaka University Institutional Repository

এর পূর্বে পুলিশ কমিশনের সুপারিশ মত দু'টি পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে কনস্টেবল ও হেড-কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। স্কুল দুটি ছিল ভাগলপুরের নাথনগরে এবং মনভূমের পরুলিয়ায়। ভাগলপুর প্রশিক্ষণ স্কুলে অ-বাঙ্গালীদের (up-country men) প্রশিক্ষণ দেয়া হত আর পুরুলিয়া প্রশিক্ষণ স্কুল বাঙ্গালী কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। তবে ১৯০৫ সালে পুরুলিয়ার স্কুলটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার বায়হামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। একই বছরে রাঁচিতে কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল খোলা হয়। কনস্টেবল ও হেড কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল ড্রিল, জ্যামিতি, রাইফেল চালনা, নিরাপত্তা ও প্রহরা, দায়িত্ব পালন, শারীরিক ড্রিল, বেয়নেট অনুশীলন, রায়ট ড্রিল। তবে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে প্রশিক্ষণ ব্যাহত হয়।[৯] ১৯০৫ সালে ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয় ২৭৮ জন। যার মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত হয়েছিল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, ৬৪ জনকে সরাসরি মনোনীত করা হয় এবং ১৫০ জন পুলিশ কমিশনের সুপারিশের আলোকে নির্বাচিত করা হয়।

১৯০৬ সালে পুলিশ জনবল পূর্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পায়। এ বছর নাথনগর (ভাগলপুর), পুরুলিয়া ও রাঁচি এই তিনটি প্রশিক্ষণ স্কুলে ২০৩৬ জন কনস্টেবল এবং ৩৮ জন রাইটার, হেড-কনস্টেবলসহ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।[১০] তবে সবসময় প্রশিক্ষণকারিদের একটা অংশ প্রশিক্ষনে অকৃতকার্য হত। তাদেরকে পরবর্তী ব্যাচে আবার সুযোগ দেয়া হত। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯০৭ সালে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ এ বছরের শেষের দিকে ভাগলপুর থেকে রাঁচিতে (Ranchi) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হয় এবং সে সাথে এটাকে পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯০৮ সালে লেঃ গভর্ণর এ কলেজ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষণ কাজও সাথে সাথে শুরু হয়।[১১] এ বছর নব নিয়োগকৃত ক্যাডেট সংখ্যা ছিল ১৪৯ জন, অকৃতকার্য ক্যাডেট ২ জন এবং দেশীয় রাজ্য থেকে সংগ্রহকৃত ৬ জন। তবে প্রশিক্ষণে কৃতকার্য হয় দেশীয় রাজ্যের ছয় জনের মধ্যে চার জন এবং অন্যান্যদের মধ্যে মোট ১২১ জন।

---

৯. *Report on the Administration of the Police of the Lower province, Bengal presidency*, for the year 1905, pp. (2-3).

১০. *Report on the Administration of the Police of the Lower province, Bengal Presidency for they year* 1906, p.2

১১. *Report on the Administration of the Police of the Lower province, Bengal Presidency for they year* 1908, p.31.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৮ সালে কনস্টেবলদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণের জন্য ১৪৭৩ জন (এর মধ্যে কলকাতায় ১৫২ জনসহ) এবং রাইটার হেডকনস্টেবল ৩০ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর তাদেরকে যথারীতি প্রশিক্ষণ স্থলে প্রেরন করা হয়। অবশেষে ১৩৯৯ জন সাফল্য সহকারে প্রশিক্ষণ কর্মে উত্তীর্ণ হয় আর হেড কনস্টেবলদের মধ্যে ২৫ জন প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হয়। প্রশিক্ষণে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করার কারনে প্রশিক্ষণার্থী কনস্টেবলদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক অকৃতকার্য হয়। অবশ্য হেড কনস্টেবললদের ক্ষেত্রে ৩০ জনের মধ্যে ৫ জন বাদে সবাই উত্তীর্ণ হয় প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে নতুন কোর্সের মধ্যে ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা, পুলিশদের দেশপ্রেম রীতি, বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ পরীক্ষণ প্রভৃতি বিষয় এবং অশিক্ষিত কনস্টেবলদের স্বাক্ষর জ্ঞান দানসহ তাদেরকে লিখতে ও পড়তে পারার মত শিক্ষা দেয়া হয়।[১২]

১৯০২ সালের পূর্বে পুলিশদের নামে মাত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হত। সুপরিকল্পিত কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না বললে চলে। তাই সামরিক বাহিনীর অফিসারদেরকে পুলিশ বিভাগে নিয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী পুনর্বিন্যাস করা হয়। এই সামরিক অফিসারগনই পুলিশ প্রশিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতেন। ১৯১২ সালে ঢাকার মিল ব্যারাকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে রাজশাহীর সারদায় স্থানান্তরিত করার পর পুলিশ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে।

সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজ

ঢাকায় ২ মাসের সীমিত নিরীক্ষামূলক কোর্স সম্পাদনের সময় ১৮৯৩ সালে বাংলায় পুলিশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাগলপুরে একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশনের সুপারিশের আলোকে ঢাকায় প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়—যা পরবর্তীকালে সারদায় স্থানান্তরিত হয় এবং প্রশিক্ষণ কলেজ হিসেবে কাজ শুরু করে।[১৩]

---

১২. *Report on the Administration of the Police of the lower proviences, Bengali Presidency for the year* 1908, p.31.

১৩. N. R. Razvi, *Op, cit.* p. 126.

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মানদীর তীরবর্তী রাজশাহী জেলার সারদাহ গ্রামের ভাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিত্যক্ত নীলকুঠিরকে কলেজের জন্য নির্বাচন করা হয়। আর এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন Major H. Chamney যিনি ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পুলিশ সুপারের পদ মর্যাদায় সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[১৪]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি এই কুঠির নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে। ১৮৩৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি এই কুঠি ত্যাগ করলে রবার্ট ওয়াটসন নামক এক ইংরেজ ব্যবসায়ী এটি ক্রয় করেন। এখানে সিল্কের চাষ হতো। পরিশেষে ১৯১২ সালে সরকার এটা ক্রয় করে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বড়কুঠি যা বর্তমানে অফিসার্স মেস, ছোট কুঠি যা বর্তমানে অধ্যক্ষের বাসভবন, গোলাভবন, ব্যারাক এবং অন্যান্য ইমারত রয়েছে।

১৯১৩ সালের পরে প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, হেড-কনস্টেবল এবং স্টাফদের জন্য কলেজে ৪ সারিতে কোয়ার্টারস করা হয়। এছাড়া দ্বিতল বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, চীফ মেডিক্যাল অফিসার, তিনতলা ভবন, সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণের জন্য যাতে ক্লাশরুম, পুলিশ জাদুঘর, একটি আদর্শ পুলিশ স্টেশন, একটি বিনোদন কক্ষ, আইন নির্দেশক লাইব্রেরী, সাব-অর্ডিনেট অফিসারদের অতিথি কক্ষ ইত্যাদি রয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারদা প্রশিক্ষণ কলেজে পুলিশ সার্ভিস অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত এবং এছাড়া সরাসরি সাব-ইন্সপেক্টর এবং কন্সটেবলদের প্রশিক্ষণও এখানে দেয়া হত। ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯১২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে তিনজন ইন্সপেক্টর, ১১৫ জন ক্যাডেট (শিক্ষানবিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও হেড কনসটেবল) প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে। তবে এর মধ্যে তিনজন ইন্সপেক্টর এবং ১০২ জন সাব-ইন্সপেক্টর ও হেড কনসটেবল সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে।[১৫] এভাবে ১৯১২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুলিশ প্রশিক্ষণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এটি বিবেচিত হয়।

---

১৪. N. A. Razvi, *Op. cit.* p. 128.

১৫. *Report on the Police Administration in the Bengal presidency for the year 1912.* p.15.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রদেশের সীমানা রাজনৈতিক কারণে ১৯০৫ সালে ও ১৯১১ সালে পরিবর্তিত হলে পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। প্রশাসনিক প্রতিবেদনের রেকর্ড অনুযায়ী বাংলা প্রদেশের সীমান্তভুক্ত জিলা সমূহের ১৯০৪ এবং ১৯১৫-১৬ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত পুলিশ জনবল নিম্নে সারণিতে উল্লেখ করা হল ঃ

সারণি-৭

১৯০৪ ও ১৯১৫-১৬ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত পুলিশ স্টাফ

পদবী	১৯০৪ সনে বরাদ্দকৃত পুলিশ জনবল	১৯১৫-১৬ সনের বাজেটে বরাদ্দকৃত পুলিশ জনবল
ইনসপেক্টর জেনারেল	০১ জন	০১ জন
ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল	০২ জন	০৪ (+ ১জন অস্থায়ী) জন
সুপারিনটেডেন্ট	৩১ (+২) জন	৪৮ (+ ১ অস্থায়ী) জন
সহকারী সুপারিনটেডেন্ট	-	৪৭ জন
ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টস	-	২৩ (+ ২ অস্থায়ী) জন
ইনসপেক্টর	১৩৮ জন	২৩৯ জন
সাব-ইনসপেক্টর	১১০৪ জন	১৬০৩ জন
সার্জেন্টস	২২ জন	৪৪ জন
হেড-কনস্টেবলস	১১২১ জন	২২৯৮ জন
কনস্টেবল	১২,৮৪৮ জন	১৭০২৪ জন

উৎস ঃ W. R. Gourlay, *A Contribution towards a History of the Police in Bengal*, p. 144.

উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যায় যে সাব-অর্ডিনেন্ট স্টাফদের ক্ষেত্রে ১৯০৪ সনে বরাদ্দকৃত জনবল থেকে ১৯১৫-১৬ সনের বাজেটে বরাদ্দকৃত পুলিশ জনবল বৃদ্ধি করা হয় নিম্নরূপ ঃ

ইনসপেক্টর পদে	=	১০১ জন
সাব ইনসপেক্টর পদে	=	৪৯৯ জন
সার্জেন্ট পদে	=	২২ জন
হেড-কনস্টেবল পদে	=	১১৭৭ জন
কনস্টেবল পদে	=	৪৩২৮ জন

এবং সুপিরিয়র অফিসারদের ক্ষেত্রে ৮৭ জন জনবল বৃদ্ধি পায়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত পরিসংখ্যানে পুলিশ পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের পদে পূর্বে কোন নিয়োগ দেয়া হয় নি। তবে, অন্যান্য পদে নিয়োগ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৯ সনে অক্ষমতাজনিত বা ক্ষতিপূরণজনিত অবসরপ্রাপ্ত কনস্টেবলদের পুনঃ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন আদেশ জারি করা হয়। ১৯০৯ সালের ১৯ জুন ঘোষিত এই আদেশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

Subject and Order

Re-employment of constables after retirement on invalid or compensation pension.

Forwarding to the Inspector-General of Police and the commissioner of Police, Calcutta, for information and guidence, copy of a communication from the Government of India, Home department, ruling that a constable who has retired on an invalid or on compensation pension and is subsequently re-employed should, if his previous service counts for pension, also count such service for future increments."[১৬]

উক্ত আদেশে অক্ষমতাজনিত বা ক্ষতিপূরণজনিত অবসরপ্রাপ্ত কনস্টেবলদের পুনঃনিয়োগের পাশাপাশি আরো বাড়তি সুবিধার কথাও বলা হয়। যদি পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত কনস্টেবল এর পূর্ববর্তী চাকুরি পেনশনের জন্য গণ্য করা হয়, তবে তার ভবিষ্যত ইনক্রিমেন্টের জন্য তা গণ্য হবে। এই ধরনের আদেশ কনস্টেবলদের বিশেষ করে অক্ষমতাজনিত বা ক্ষতিপূরনজনিত অবসরপ্রাপ্ত কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে। পুলিশ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাব-ইনসপেক্টরদের আরো কৌশলগত ভাবে দক্ষ করে তোলার জন্য ১৯১২ সালে শ্রুতলিপি (Short-hand) শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকায় যেসব সাব ইনসপেক্টর শ্রুতলিপি প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্য মাসিক ১০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা বরাদ্দ করা হয়।[১৭]

---

১৬. *Government of Bengal, B-Proceedings*, Home Departments, Police Branch, June, 1909, Proceedings No p.3.

১৭. *Government of Bengal, B-Proceedings*, Home Departments, Police Branch, May, 1912, Proceedings Nos, 50-81.

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রযুক্তি আজকের মত উন্নত পর্যায়ে ছিল না, তাই স্বল্প সময়ে দ্রুতভাবে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্য Short hand প্রশিক্ষণ পুলিশ বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব স্থানীয়ভাবে নিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আগত যুবকদের কনস্টেবল হিসেবে অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছর বাংলা প্রদেশের কমিশনের সুপারিশ মত কনস্টেবল নিয়োগ দুষ্কর হয়ে পড়ে। কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। নিয়োগ প্রাপ্তদের একটা বড় অংশ জিলা চৌহদ্দির বাইরের থেকে আগত। ফলে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত স্থানীয়দের দ্বারা কনস্টেবল নিয়োগের সংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পায় নি। এছাড়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের থেকেও এমন সাড়া মেলেনি।[১৮]

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট হতে সাড়া না পাবার কারণ ছিল পুলিশ বিভাগের চাকুরিতে কাঙ্খিত বেতন ছিল না। আর স্থানীয়দেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী না পাবার কারণ ছিল যে, স্থানীয়রা কৃষিতে নিয়োজিত হত। তারা কৃষি চাষ ভাল বুঝত, ফলে ভাল ফসল উৎপন্ন হত। আর ফসলের দামও ভাল ছিল। তাই সাময়িক আর্থিক সুবিধার দিকে তাকিয়ে স্থানীয়রা চাকুরিতে না গিয়ে কৃষিতে মনোনিবেশ করতো।[১৯] স্থানীয়ভাবে পুলিশ নিয়োগের মাধ্যমে পুলিশ জনসাধারণকে সহজে অনুধাবন করতে পারে এই উপলব্ধি আরো বেশী মাত্রায় অনুভূত হয় ১৯১৪ সনে। তার প্রমান পাওয়া যায় ইন্‌সপেক্টর জেনারেলের স্থানীয়ভাবে কনস্টেবল নিয়োগ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সুপারিশ থেকে ঃ

"The Inspector-General of Police recommends that efforts should now be made to encourage local men to enter police as constables and the rules in the Bengal and the Eastern Bengal and Assam Police Mannuals regarding the recruitment of local men as constables and the proportion of foreigners should be amended accordingly. After a careful consideration of the advantage and disadvantages of the system proposed by the Inspector-General, it is held that the proposal scheme, if sanctioned would reduce rather than increase the area for the recruitment of local recruitments. The Inspector General of Police is informed unofficially.[২০]

১৮. W.R. Gourlay, *Op. cit.*, p. 146.
১৯. *Report on the police Administration of the Bengal presidency for the year* 1912, p.6.
২০. *Government of Bengal, B-Proceedings*, Home Department, Police Branch, July, 1914, Proceeding No. 434.

Dhaka University Institutional Repository

এরপর থেকে স্থানীয় কনস্টেবল নিয়োগের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। পুলিশ সংগঠনের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯১৩ সনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিধি পালন করা হয় যা ১৯০২-০৩ সনের কমিশনের সুপারিশে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। ১৯০২-০৩ সনে কমিশনের সুপারিশে পুলিশ সংগঠনে নব-নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক উচ্চতার সুনির্দিষ্ট পরিমাপ স্থির করা হয়নি। কর্তব্য পালনে সক্ষম এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হলে শারীরিক উচ্চতাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হত না। আর বয়সের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালে পুলিশ ফোর্সে নিয়োগের জন্য গড় উচ্চতা নির্ধারিত করা হয় ৫´৫´´ (৫ ফুট ৫ ইঞ্চি) এবং গড় বয়স ২১ বছর ৮ মাস।[২১]

১৯১৩ সনে পুলিশ সংগঠনের নন-গেজেটেড অফিসার সংখ্যা ছিল ১৭৪৬ জন, এর মধ্যে ইউরোপীয় সংখ্যা ছিল ৮২ জন এবং ১৯১৪ সনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭৭৭ জন এবং ইউরোপীয় সংখ্যা ছিল ৮০ জন। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সনে নিয়োগ ও পুলিশ জনবল প্রায় একই ধরনের ছিল। তবে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু নতুন কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স সংক্রান্ত (Mannual of Medical Jurisprudence)
(খ) রিভলবার চালানো ও অনুশীলন বিদ্যা (Revolvor Drill and practice)
(গ) ক্রিমিনাল ট্রাইবস এ্যাক্ট (Crimal Tribes Act)
(ঘ) গোপনীয় অফিস বিধান (Offical Secrets Act)
(ঙ) প্রেস এ্যাক্ট (Press Act)[২২]

এই Medical Jurisprudence কোর্সটি সংযোজিত করেন Colonel Cambell। তিনি ছিলেন সিভিল হাসপাতালের ইনসপেক্টর জেনারেল। এই কোর্সটির উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া। প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেটদের বোঝানোর জন্য তিনি মিলিটারি সহকারি সার্জনদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে কোর্সগুলো বুঝতে ক্যাডেটদের কোন অসুবিধা হতো না। অবশ্য আলোচ্য কমিশন সুপারিশে Medical Jurisprudence কোর্সটি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা অনুশীলন করা হত না।

---

২১. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency*, 1913, p.11.
২২. *Ibid.* p.13.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯১২, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সনে পুলিশ প্রশাসন মূলতঃ ১৯০২-০৩ সনের কমিশনের সুপারিশের মৌলিক ভিত্তি অনুসরণ করে। এই সময় পুলিশের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সূচক না থাকলেও সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধচিত্রের পরিসংখ্যান থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। নিচের সারণিতে বাংলার কতিপয় উল্লেখযোগ্য জিলায় ১৯১২, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ চিত্রের পরিসংখ্যান দেয়া হল ঃ

সারণি-৮
বিভিন্ন জিলায় ১৯১২, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, লুণ্ঠন ও সিঁদচুরির সংখ্যা ঃ

জিলা	দাঙ্গা			খুন			ডাকাতি			লুটপাট			সিঁদচুরি		
	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪
যশোর	৩৯	২৩	৩৩	১৫	১০	১৫	১২	২	২	৭	৫	৮	১০৭৬	১৩৩০	১২৯১
খুলনা	২৫	৩৯	৫০	২৪	১৭	২০	২	৫	৭	৩	৩	৫	৮২৩	১১০১	১০৯১
ঢাকা	৫৮	৬১	৬১	২৩	২৪	৩৫	১১	১০	১৩	৮	৮	১৪	২৮৭৬	২৭৯১	২৫৮০
ময়মনসিংহ	৮৩	৫৮	৭২	৪১	৪৪	৩৮	৯	১০	১১	১৩	১২	৮	৩৪৪৩	৪৫৫৫	৪৫৫২
ফরিদপুর	১০৬	৮৮	৪৪	৬	১২	১৫	১১	১৬	৩৪	৫	৪	৫	১১৬৯	১৫৯৫	১৩৯১
বাকেরগঞ্জ	৪৬	৬২	৫০	৪০	৪৪	৩৯	১০	২৯	২৬	৮	২৩	১	১৯৩৪	১৯৭৯	১৮০৮
চট্টগ্রাম	২০	১৭	১৬	৪	৪	৬	১	২	২	২	২	৭	৭০৯	৬০৭	১০০২
নোয়াখালী	২৪	১৬	১২	৪	৪	১০	-	-	-	২	-	৭	-	৩৯৬	৩৮৭
রাজশাহী	৩৪	২৭	২৪	১২	৯	১১	৫	৯	১৭	২	৩	১৮	৯৫৬	১০৭৫	১০৩০
দিনাজপুর	২২	২২	০৬	৮	১২	১৫	৪	৯	১৮	১৩	৬	৭	১০২১	১১২২	৯০৬
বগুড়া	৭	২১	১৪	৫	১১	১২	৫	৭	৮	৩	৭	৭	৫৮৫	৭৫৬	৬৫৮
২৪ পরগনা	৭৬	৫৪	৪৮	২৪	১৮	২২	২৫	২২	১৭	২২	২৪	২১	২৩৫২	২০৫০	২০৭২
মোট	৫৪৩	৪৮০	৪৩০	২০৬	২১২	২৫৮	১০৫	১২১	১৫৫	৮৮	৯৭	১০৮	১৬৯২৪	১৯৫২৭	১৮৭৪৮

উৎস ঃ *Reports on the Police Administration in the Bengal Presidency* 1913. p.13.

উল্লেখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলার বিভিন্ন জিলায় সংঘটিত দাঙ্গা বা রায়ট ১৯১২ সালের তুলনায় ১৯১৩ ও ১৯১৪ সনে অধিকাংশ জিলায় কমেছে। তবে, ব্যতিক্রম ছিল খুলনা, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ ও বগুড়া জিলা। আর খুন এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ ও ২৪-পরগনা জিলায় হত্যা সংখ্যা কিছু কমে বা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। আর বাকী জিলাগুলোতে হত্যা এর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাকাতির ক্ষেত্রে খুলনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জিলায় ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে বেশী মাত্রায় সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে সিঁদচুরির সংখ্যা ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় ব্যাপকহারে।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে স্বাভাবিক নিয়মে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপরেও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধ দমন করা পুলিশ সংগঠনের মৌলিক দায়িত্ব। উল্লেখিত সময়ে অপরাধ পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচারে বলা যায় যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সংগঠন তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। যদিও বা অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির এই চালচিত্র সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশিক্ষণের ব্যর্থতা পরিমাপের ব্যারোমিটার নয়। কেননা, অপরাধ প্রবনতাবৃদ্ধির সাথে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ সংশ্লিষ্ট। এছাড়া জনসংখ্যা ও জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি না করাও অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯১২ সালের পর থেকে বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য ১৯১৩ ও ১৯১৫ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। আবার পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়োগ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বাঙালীদের নিয়োগের শতকরা হার নিচের সারণি থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে।

সারণি-৯

১৯১২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কনস্টেবল পদে মোট নিয়োগ সংখ্যা, বাঙালীদের নিয়োগ সংখ্যা ও বাঙালীদের নিয়োগের শতকরা হার ঃ

বছর	মোট তালিকাভুক্ত নিয়োগ সংখ্যা	বাঙ্গালীদের সংখ্যা	বাঙ্গালীদের শতকরা হার
১৯১২	৩০১৮	১০২১	৩৩
১৯১৩	৩৫৩৯	৯৭০	২৭
১৯১৪	২৯৪৬	১২৩৬	৪২
১৯১৫	৩৭৫৯	১১২৫	২৯
১৯১৬	৩৪৩১	১৩১৮	৩৮
১৯১৭	২৯৯২	১৬০৮	৫৩
১৯১৮	২৯১১	১৮৪৭	৬৩
মোট	২২,৫৯৬	৯,১২৫	৪০

উৎস ঃ *Report on the Police Administration of the Bengal Presidency*,1918, p.4.

সারণির পরিসংখ্যান লক্ষ করলে দেখা যায় বাঙালীদের নিয়োগ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ ১৯১২ সালে বাঙালীদের নিয়োগের শতকরা হার ছিল তেত্রিশ কিন্তু ১৯১৩ ও ১৯১৫ সাল বাদে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৮ সালে দাঁড়ায় তেষট্টিতে। পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩ এর রিপোর্টের সুপারিশে স্থানীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্যের কথা বলা হলেও সবসময় তা বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বাঙালীদের নিয়োগের শতকরা গড় ছিল চল্লিশ। এ থেকে বুঝা যায় বাকী নিয়োগ পেত বিহার, আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলের অবাঙালীরা।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯১৬ সনে ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেলের (DIG-Deputy Inspector-General of Police) একটি বাড়তি পদের জন্য আবেদন করা হলে ভারত সচিব কর্তৃক তা ১৯১৭ সনে অনুমোদিত হয়।[২৩]

পুলিশ সংগঠনের সহকারি সাব-ইনসপেক্টর, হেড-কনস্টেবল এবং কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের আনুপাতিক পার্থক্য সংখ্যা প্রায় একই ধরনের ছিল। নিচের সারণিতে কয়েক বছরের নিয়োগ সংখ্যার শতকরা হার হতে এই বক্তব্যের সাধারণ সমর্থন পাওয়া যায়।[২৪]

সারণি-১০

সাব- ইন্সপেক্টর, হেড-কনস্টেবল ও কনস্টেবল পদে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়োগের শতকরা হার ঃ

	১৯১৩	১৯১৪	১৯২১	১৯২৮	১৯৩০	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৭
হিন্দু	৭৮.৯%	৬৯.৪%	৬৭.৩%	৭০.৭%	৭০.৩%	৬৮.৯%	৬৯.৪%	৬৮.৭%
মুসলমান	২১.২%	২৪.৪%	৩০.৩%	২৬.৭%	২৭.২%	২৮.১%	২৭.৯%	২২.৭%
অন্যান্য						৩%	২.৭%	৩.৬%

উৎস ঃ *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency*, 1913, 1914, 1921, 1928, 1930, 1933, 1934, 1937.

এ পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের শতকরা হার ২৫ এর কাছাকাছি এবং হিন্দুদের সংখ্যা ৭০ এর কাছাকাছি অর্থাৎ হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৩ (তিন) গুণ বেশি ছিল। আর এটা প্রায় সব সময় অব্যাহত ছিল যার প্রমাণ উক্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করলে পাওয়া যায়। হিন্দুদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ ছিল সেসময় হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক সচেতনায় অধিক অগ্রগামী ছিল। ফলে নিজেদের সুযোগ সুবিধা তথা আর্থিক সংস্থানের জন্য হিন্দুরা বেশী মাত্রায় পুলিশের চাকুরিতে প্রবেশ করে। আর মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ সচেতনতায় অপেক্ষাকৃত পিছনে ছিল বিধায় তারা এসব সুযোগ থেকে বেশীমাত্রায় বঞ্চিত হয়। ইতোপূর্বে সাব-ইনসপেক্টর পদে সরাসরি নিয়োগদানের কথা জোর দিয়ে বলা হলেও হেড-কনস্টেবল থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সাব-ইনসপেক্টর পদে নিয়োগকে একেবারে বন্ধ করার বিধান ছিল না। তবে, এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৫% তে সীমিত রাখা হয়।

---

২৩. A Gupta, *The Police in British India*, p. 322

২৪. *Reports on the Police Administration in the Bengal Presidency* 1913, 1914, 1921, 1928, 1930, 1933, 1934, 1937 থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে কয়েক বছরের সাব-ইন্সপেক্টর পদে সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেয়া হল ঃ

সারণি-১১

সাব-ইন্সপেক্টর পদে কয়েকটি নির্দিষ্ট বছরে মোট নিয়োগ সংখ্যা, সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগ সংখ্যা ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ সংখ্যা ঃ

বছর	১৯০৪	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৬	১৯২২	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩৩	১৯৪০
নিয়োগপ্রাপ্ত সাব-ইনসপেক্টর সংখ্যা	২৯	১২৮	১২৭	১৪৭	১০৬	৬০	৬৬	৬৬	৯৯	১০০
সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগ সংখ্যা	১৫	১০৮	৯৮	১২৫	৩৩	৩০	৩৩	৩৩	৬৬	৫০
পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ সংখ্যা	১৪	২০	২৯	২২	৭৩	৩০	৩৩	৩৩	৩৩	৫০

উৎস ঃ Report on the Police Administration in the Bengal Presidency, 1904, 1913, 1914, 1916, 1922, 1928, 1929, 1930, 1940 থেকে সংগৃহীত।

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে নিয়োগদানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগদানের সংখ্যা বেশী যা কমিশনের সুপারিশের সাথে মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আর ১৯২২ সালের পর থেকে দেখা যায় যে নিয়োগের ক্ষেত্রে (১৯৩৩ সালের নিয়োগ বাদে) সরাসরি পদ্ধতি ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ সংখ্যা সমান। অবশ্য ১৯২২ সালে পদোন্নতির মাধ্যমে সাব-ইনসপেক্টর নিয়োগ সংখ্যা সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। তাই স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ১৯২২ সালের পরে সাব-ইনসপেক্টর পদে নিয়োগদান কমিশনের সুপারিশের আলোকে হয়নি। অর্থাৎ কমিশন আরোপিত নীতিমালায় বাস্তবায়ন ঘটেনি।

নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯২২ সালে বড় ধরনের একটা শূন্যতা দেখা দেয়। আর এই শূন্যতা দেখা দেয় কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে। এর মূল কারণ ছিল নব নিয়োগের জন্য প্রার্থিরা ডাক্তারি পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে অকৃতকার্য হয়। এছাড়া বাঙালীরা খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে নি। অর্থাৎ কনস্টেবল পদের জন্য বাঙ্গালীদের আকর্ষণ ছিল কম। যারা আগ্রহী ছিল তারা আবার অধিকাংশ "শিক্ষিত পুলিশ" শাখার জন্য অর্থাৎ করনিক দায়িত্ব (clerical duties) বেশী পছন্দ করতো। এ বছরে কনস্টেবলদের জন্য ৪২০০ পদ বরাদ্দ হলেও এইপদে মাত্র ১৩৮ জনকে নিয়োগের জন্য পাওয়া যায়।[২৫]

২৫. *Report on the Administration of Bengal* 1922-23, para-72.

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় পুলিশ কনস্টেবলদের কিছু নতুন বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের ট্রেনিংরত কনস্টেবলদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত ছিল তাদেরকে ইংরেজি বর্ণমালা, রং সনাক্তকরণ, ঘড়ির সময় পড়তে শেখা এবং টেলিফোন ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[২৬] ১৯২৭ সালে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণের কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে বারজন শিক্ষানবিশ সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট এর মধ্যে আটজন প্রশিক্ষণ কলেজ ত্যাগ করেছিল। ফলে বাকী ৪ জনের সঙ্গে আরো নব নিয়োগকৃত চারজন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট (দুইজন ইন্ডিয়া, দুই জন ইংল্যান্ড) নিয়ে মোট ৮ জন প্রশিক্ষণে অংশ নেয়।

আর এ বছর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কনস্টেবলের সংখ্যা ২৭৩৮ জন ছিল, তবে প্রশিক্ষণ সফল্যজনকভাবে শেষ করতে সক্ষম হয় ১৭৫২ জন।[২৭] অর্থাৎ একটা বড় অংশ অকৃতকার্য হয় যা বরাবরই লক্ষ করা গেছে। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পর্বটি প্রায় একই ধারাবাহিকতায় চলে অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন রদবদল ছিল না। ১৯৩৬ সালেও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে Curriculum or Method of training এর কোন পরিবর্তন হয়নি। এ বছর চুয়াল্লিশ জন শিক্ষানবিশ সাব-ইনসপেক্টর প্রশিক্ষণে অংশ নেয় এবং যার মধ্যে একচল্লিশ জন কৃতকার্য হয়। অর্থাৎ সাব-ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রশিক্ষণের সাফল্যের হার বেশী ছিল। ১৯৩৭ সালে শিক্ষানবিশ সাব ইনসপেক্টরের সংখ্যা ছিল ৮০ জন।এর মধ্যে অর্ধেক সরাসরি নিয়োগ আর বাকী অর্ধেককে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। সহকারি সাব ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে ১৭৪ জনের মধ্যে ১৬৪ জন পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ১০ জন সরাসরি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়।[২৮]

এই নিয়োগ ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ পুরোপুরি অনুসরন করা হয়নি। কেননা কমিশন সুপারিশে সাব-ইন্সপেক্টর পদে সরাসরি নিয়োগকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবে ১৯৩৭ সালে সাব-ইনসপেক্টর পদের নিয়োগ সংখ্যায় দেখা যায় যে অর্ধেক সংখ্যক পদে পদোন্নতি এবং বাকী অধিক সংখ্যক পদে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

---

২৬. *Ibid*, para-73.

২৭. *Governemnt of Bengál, Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year* 1927, pp(13-14).

২৮. *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency*, 1937.

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন রিপোর্টে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকে একেবারে বন্ধ করার কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ অল্প সংখ্যককে অনুমোদন করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। সহকারী সাব-ইনসপেক্টরের ক্ষেত্রে ১৭৪ জনের মধ্যে পদোন্নতির মাধ্যমেই নিয়োগ হয়েছে ১৬৪ জনের অর্থাৎ যা ১৯০২ সালের কমিশন রিপোর্টের সুপারিশের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এভাবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুলিশের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক কিছু কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হয়নি।

তবে পুলিশ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী ও সংস্কারের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়।[২৯] ১৯৩৭ সনে Blandy Gordon কমিটিতে কিছু পরিবর্তনের কথা আনা হলেও অল্পকাল মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের কারণে কোন সংস্কার বাস্তবায়ন করা সম্ভপর হয়নি।[৩০] ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই সময় বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে ছিল। তবে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পুলিশ বিভাগে যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় পুলিশ জনবলের দারুন সংকট দেখা দেয়। এই সংকট কাটিয়ে পুলিশ বিভাগকে সুগঠিত করার লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ১৯৫৩ সালে সাহাবুদ্দিন কমিটি গঠিত হয়।

৩.৩ উপসংহার

১৯৪৭ সন পর্যন্ত পুলিশ সংগঠনের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বিষয়ের সার্বিক পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সামান্য রদবদল এবং কিছু যোজন-বিয়োজন ছাড়া ১৯০২-০৩ সনের কমিশনের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশের বৃহদাংশের বাস্তবায়ন ঘটেছে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমল এমন কি স্বাধীনতা অর্জনের পরেও বাংলাদেশে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি ১৯০২-০৩ সনে কমিশনের সুপারিশের আলোকে রচিত হয়েছে। অতএব, ১৯০২-০৩ সনের কমিশনের সুপারিশকে পুলিশ সংগঠনের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

---

২৯. এ সময়ে প্রাদেশিক ভিত্তিতে কিছু কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়। বাংলায় ১৯৩৭ সনে Blandy Gordon Report, ১৯৩৮-৪০ সনে ঢৌকিদারি তদন্ত কমিটি, ১৯৪৭ এরপর ১৯৫৩ সনের Shahabuddin Report, ১৯৬০-৬১ সনে পুলিশ কমিশন (Constantine Commission) এবং ১৯৬৯ সনে পুলিশ কমিশন (Mitha Commission) গঠিত হয়।

৩০. *Report of the Committe on Police Training*, 1977, p. 32.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
পুলিশের কার্যাবলী

একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-কানুন বজায় রাখা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান, অপরাধ দমন, অপরাধীকে গ্রেফতার ও অপরাধ তদন্তসহ নানাবিধ মৌলিক কর্তব্য পালন পুলিশের কার্যাবলীর অংশ। পুলিশকে সমাজের সামগ্রিক কার্যাবলীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকতে হয়। কেননা সমাজকে স্থিতিশীল রাখার দায়িত্বও পুলিশের ওপর অর্পিত। তাই বিখ্যাত আইনবিদ *Black* পুলিশের কার্যাবলীর সুষম ধারনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, যদি কেবল অপরাধ দমন ও আইন বলবৎকরণই পুলিশের কাজ হতো, তবে পুলিশের পক্ষে তাদের কাজ পূর্ণমাত্রায় করা সম্ভব হত। কার্যতঃ পুলিশের কাজ আরো বেশী। কারণ পুলিশের কাজের সময় এবং শক্তির একটি অপরিহার্য অংশ ব্যয় করতে হয় সমাজের মানবিক সমস্যা সমাধানে। ফলে, অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে কিছু করার সময় ও সুযোগ পুলিশের জন্য অনেকটা কমে যায়।[১]

এই অধ্যায়ে পুলিশের সার্বিক ভূমিকা অর্থাৎ পুলিশের সাধারণ কার্যাবলী, পুলিশ পেট্রোল, দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রণ, পুলিশের সীমাবদ্ধতা এবং সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশী ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

১. Black. A. *The people and the Police.* p.10.

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ পুলিশের সাধারণ কার্যাবলী

সমাজে পুলিশের ভূমিকায় বিভিন্ন দিক রয়েছে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংগঠনিক পার্থক্যের জন্য পুলিশের কার্যাবলীর মাত্রাগত ভিন্নতা রয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুলিশের সাংগঠনিক আকার, আয়তন ও পরিবেশগত অবস্থান অনুযায়ী পুলিশের কার্যাবলীর ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পুলিশের কতকগুলি সাধারণ কার্যাবলী রয়েছে যা প্রায় একই প্রকৃতির। বাংলাদেশের পুলিশের ক্ষেত্রে সাধারণ কার্যাবলীকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায়–

১. সরকারের নির্দেশমত আইন বলবৎ রাখা,

২. জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান,

৩. আইন ও বিধি অনুযায়ী জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা,

৪. আইনের প্রতি হুকমিকারির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

৫. সড়ক-জনপথ, রাজপথ, সাধারণ রাস্তাঘাট ও বন্দর এবং যেসব জায়গায় জনসমাবেশ ঘটে, এছাড়া যেসব এলাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে অথচ বিক্ষোভ হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা,

৬. ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা, পথচারি ও নৌপথের যানবাহনের নিরাপত্তা দান করা,

৭. রাজনীতি ও অপরাধ সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা,

৮. অপরাধ প্রতিকার ও তা নির্ণয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

৯. চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করাসহ হারানো জিনিসপত্রের সন্ধান করা,

১০. বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পাদনা করাসহ কোর্ট সম্পর্কিত নির্দেশাবলী কার্যকর করতে দায়িত্ব পালন করা,

১১. দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের সাহায্য করা এবং জনগণকে প্রাথমিক সাহায্য করা, যানবাহনের দুর্ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ কার্যকারী ভূমিকা পালন করা,

Dhaka University Institutional Repository

১২. নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা,

১৩. যুব ও কিশোর অপরাধ সংশোধনী ও প্রতিকারের জন্য সমাজকল্যাণ বিভাগকে সহযোগিতা করা।[২]

এছাড়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা প্রদান বা প্রতিরক্ষা সহচর হিসেবে পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। উল্লেখ্য যে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা উদ্ভবের পূর্বে রাজা-বাদশাহদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পাহারাদার নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এ দায়িত্ব পুলিশের ওপর অর্পিত হয়েছে। আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় প্রধান ছাড়াও অন্যান্য যারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন তাঁদের প্রতিরক্ষা সহচর হিসেবেও পুলিশ ভূমিকা পালন করে।

আসলে পুলিশী দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন না কোন দায়িত্ব আপনা-আপনি পুলিশের ওপর বর্তায়। সামাজিক জীবনে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে রাস্তার বেওয়ারিশ লাশ সরানো পর্যন্ত সব কাজই পুলিশী দায়িত্বের পর্যায়ভুক্ত। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা। আর পুলিশ এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে সমাজে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সরকারি নীতি বাস্তবায়নে পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।[৩] প্রকৃত অর্থে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুলিশ আর্থিক উন্নয়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখে। বিভিন্ন ব্যাংক যে ঋণদান করে তা আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পুলিশী সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। অবৈধভাবে বা সরকারি অনুমতি ছাড়া কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতে থাকলে তা বন্ধ, অবৈধ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্নকরণের অভিযানে পুলিশকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

---

২. M. Azizul Huq, 'Bangladesh Police—Its Organizational Pattern and Emerging Role in the Society', *Administrative science Review, Journal of the National institute of public Administration*, Dhaka, vol IX, No-3, September, 1979, p. 14.

৩. মোঃ মতিয়ার রহমান, *রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও পুলিশ*, ডিটেকটিভ, ১২তম সংখ্যা, ১৫ জুলাই, ২০০০, পৃঃ৭।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সমাজসেবামূলক অনেক কাজে পুলিশকে জড়িত হতে হয়। যেমন পুলিশকে অনেক সময় নিখোঁজ বালক-বালিকাদের খুঁজে বের করতে হয়, আবার বেওয়ারিশ কাউকে থানায় নিয়ে হেফাজতে রাখতে হয়। রাস্তায় পড়ে থাকা পাগল ও উন্মাদদের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা করাসহ ভাসমান পতিতাদের মাধ্যমে সমাজ যাতে দুষিত না হয় সেরূপ ব্যবস্থা পুলিশকে গ্রহণ করতে হয়। বন্যা, খরা-ভূমিকম্প, নদী ভাঙ্গন এবং প্রলয়ংকারি ঘূর্ণিঝড়ে নিঃশেষ হওয়া লোকদের সাহায্যের জন্য পুলিশদের এগিয়ে আসতে হয়। মোট কথা উন্নত দেশের মত বাংলাদেশের পুলিশকে তাদের বিশেষ কাজের পাশাপাশি অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলীও সম্পাদন করতে হয়। অবশ্য এসব কাজকে সেবাধর্মী বা মানব কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যেহেতু পুলিশের সাধারন কার্যাবলী ছাড়া অন্যান্য সেবাধর্মী কাজকে কোন নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ করা যায় না, তাই অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশকে তার এখতিয়ার বহিঃর্ভূত কাজে এগিয়ে আসতে হয়। পুলিশের কার্য সম্পর্কে আইন বিশেষজ্ঞ Jerome Skolnick এর যথার্থ জিজ্ঞাসা হচ্ছে "For what social purpose do police exist? What values do police serve in a democratic society?"[৪] বাস্তবিক পক্ষে পুলিশের কাজ কি এর প্রত্যুত্তরে কোন একক চিন্তাপ্রসূত উত্তর পাওয়া যাবে না। তবে সর্বসাধারণের উত্তর হবে—আইন বলবৎ রাখাই পুলিশের কাজ। আসলে পুলিশের কার্যাবলী বিভিন্নমুখী।

এছাড়া Samuel Walker,[৫] American Bar Association এর উদ্ধৃতি দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরের পুলিশের জন্য যে সমস্ত দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন তা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলের পুলিশের জন্যও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের পুলিশের দায়িত্বের সাথে আমেরিকার পুলিশের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্র নিম্নে আলোচনা করা হল।

---

৪. Skolnick, Jerome, *Justice without trial : Law enforcement in democratic society*, p.1.

৫. Samuel Walker, *The Police in America an Introduction*, p.64.

Dhaka University Institutional Repository

১. আমেরিকাতে শহরের পুলিশের প্রধান কর্তব্য হল অপরাধীকে সনাক্ত এবং গ্রেফতার করা, তাছাড়া কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করা। আর বাংলাদেশের পুলিশের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

২. আমেরিকার পুলিশ বিভিন্ন শহরে পাহারা প্রদান করা ছাড়াও অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন শহরে অপরাধ প্রতিরোধে টহল প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে থাকে।

৩. আমেরিকার শহর-পুলিশ শারীরিকভাবে বিপদগ্রস্থকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে। অবশ্য বাংলাদেশের পুলিশের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা বিরল। এমনিতে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশের পুলিশবল অনেক কম। তাই পুলিশকে নিজেদের কর্ম সম্পাদনের বাইরে এ ধরনের দায়িত্ব পালনে সাধারণত দেখা যায় না।

৪. দেশের সংবিধান রক্ষা করা অর্থাৎ প্রচলিত আইন প্রয়োগ করা আমেরিকান পুলিশের মৌলিক কাজ যা বাংলাদেশের পুলিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৫. যে সব লোক নিজেদের সম্পর্কে যত্ন নিতে অক্ষম তাদের সাহায্য করা আমেরিকান পুলিশদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশদের এহেন কর্ম মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত। তবে অন্যান্য কার্যাবলী প্রায় একই প্রকৃতির।

৪.২ পুলিশ পেট্রোল/পুলিশ টহল

পুলিশ ব্যবস্থার শুরুতে টহল প্রথা বিদ্যমান ছিল। রাজকর্মচারি হিসেবে হয়তো প্রথম অবস্থায় রাজার নির্দিষ্ট এলাকা পাহারা দিতে হতো পুলিশকে। কালের প্রেক্ষিতে কোতোয়াল ও ফৌজদারগণ শহরে পাহারার দায়িত্ব পালন করতো। পরবর্তীকালে জমিদারি পুলিশও একই দায়িত্ব পালন করতো। জমিদারি পুলিশের পরে আধুনিক পুলিশের টহলদারি প্রথা বিদ্যমান যা পুলিশ পেট্রোল নামে পরিচিত। পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩ সালের সুপারিশে পুলিশের রোড পেট্রোল এর কথা বলা হয়েছে। যেসব রাস্তায় ডাকাতি ও অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেখানে পুলিশ-টহল ব্যবস্থা করা হয়।[৬]

---

৬. *Report of the Indian Police Commission 1902-03*, para-142.

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ টহল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা কর্মসূচী। যেসব কার্যকলাপ সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সমাজ জীবন বিধ্বস্ত করে তা প্রতিহত করার জন্য পুলিশের টহলী কার্য পুলিশ নির্বাহী বিভাগের চোখকান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৭] সমাজের অন্যান্য এজেন্সীগুলোর সাথে সহযোগিতার মারফত পেট্রোল প্রক্রিয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

জীবন ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে টহল প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জনগণ যেহেতু নিজেদের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে, তাই পুলিশ টহলের প্রধান উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে গ্রেফতার করে সুষ্ঠু বিচারের জন্য হাজির করা। এজন্য টহলকারিদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। টহলকারীদের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও নানাবিধ জনকল্যান মূলক কাজ পুলিশকে করতে হয় টহলরত অবস্থায়।

টহলরত পুলিশ রাস্তার আহত লোক বা হারানো শিশুদের যথাক্রমে হাসপাতালে ও যথাযথ স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তড়িতাহত বা ডুবন্ত কোন লোককে উদ্ধার করা টহলরত পুলিশের কাজ। কেননা টহলরত পুলিশকে প্রায়োগিকভাবে সমাজকর্মী হতে হয়। টহল পুলিশদের বিভিন্ন এলাকার সহিত পরিচিত হতে হয়। শহরের এলাকায় বা গ্রাম্য সীমানা সম্পর্কে জানতে হয়– বিভিন্ন লেন, রাস্তা, অলি-গলি ইত্যাদি সম্পর্কেও। টহলকারিদের শুধু অলি-গলি নয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় বাণিজ্যের বড় দোকান বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারনা রাখতে হয়। এছাড়া চায়ের দোকান, হোটেল, আবাসিক হোটেল, শহরের ব্যস্ততম এলাকা, পানশালা, বিনোদনমূলক আসর এবং বেশ্যালয় ইত্যাদির ওপর নজর রাখা টহল পুলিশের কাজ। অবশ্য টহল পুলিশের দায়িত্ব বিতরণ বেশ দুরূহ কাজ। কারণ কোথায় কখন কি অবস্থায় টহল পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো দরকার তা পূর্বেই অনুমান করা যায় না।

---

৭ A.B.M.G Kibria, *Police Administration in Bangladesh*, p.135.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন উপাদান যথা জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির অবস্থানের উপর নির্ভর করে টহল জোরদার করা হয়। অবশ্য বাংলাদেশে গ্রাম-গঞ্জে টহল পুলিশী প্রক্রিয়া পুরাতন অনুশীলনের অংশ। ১৯৩৭ সালে Blandy Gordan Report এর পূর্বে প্রত্যেক ফাঁড়িতে টহল পুলিশের সংখ্যা কম ছিল। তাই এই রিপোর্ট অনুসারে– জনসংখ্যা, অপরাধের সংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে টহলী পুলিশ বৃদ্ধির কথা বলা হয়।[৮] পেট্রোল শিফট (patrol shift) করা হয় কর্ম-ঘন্টা ভিত্তিতে। পুলিশ নির্বাহী বিভাগ ২৪ ঘন্টায় কয়টি শিফট হবে তা নির্ধারন করে দেয়। টহলের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে সেবা প্রদান করা। তাই বিশ্বব্যাপী টহল প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পায়ে হেঁটে টহল দান করা। এই প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হয় লন্ডনে ১৭৬৩ সালে Henry Fielding এর সংগঠিত Bow Street Runners এর মাধ্যমে। রবার্ট পীলের আধুনিক মেট্রোপলিটন পুলিশ সৃষ্টির পর থেকে প্রায় প্রতিটি সভ্যদেশেই জীবন ও সম্পদের রক্ষার্থে টহল প্রক্রিয়া গৃহীত হয়।[৯] অবশ্য টহল প্রক্রিয়ায় দুর্গম এলাকায় ঘোড়া ব্যবহৃত হত কিন্তু কালের প্রেক্ষাপটে আধুনিক যানবাহন সৃষ্টির ফলে গাড়ীতে বসেও টহল প্রদান সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে উন্নত বিশ্বে যন্ত্রচালিত যানবাহন ব্যবহৃত হয় টহলদানে কিন্তু এদেশে পায়ে হেঁটে টহল প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত টহল প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আধুনিক ছাঁপ পড়ে নি। তাই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘোড়া, বাই-সাইকেল এবং পায়ে হেঁটে পুলিশের টহল প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

---

৮. *Ibid*, p. 141.

৯. *Ibid*, p. 144.

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রণে পুলিশী ভূমিকা

কোথাও কোন আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে পুলিশকে প্রতিনিয়ত আইন অমান্যকারী কিংবা আইনভঙ্গকারির সংস্পর্শে আসতে হয়। পুলিশ প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অসহায়ত্বের মধ্যে পরিস্থিতিকে উন্নয়নের জন্য কাজ করে। বিশেষ করে ধর্মঘট, দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। পুলিশ নৈতিকভাবে সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনঃস্থাপনে বদ্ধ পরিকর। তাদেরকে কার্যকরিভাবে বিশৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ধর্মঘট ব্যবহৃত হলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মঘট পালন করে। আর শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শ্রমিক আন্দোলন ও সংঘটিত হয় যা নিয়ন্ত্রণ করাও পুলিশের কাজ।

বিশৃঙ্খল জনতা ইচ্ছাকৃতভাবে সমবেত হয় এবং দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে এবং আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়। অবশ্য দাঙ্গা হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয় না-পূর্ব থেকেই শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক পূর্বশর্ত যুক্ত থাকে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ছাত্র দাঙ্গা বেশীমাত্রায় বিপর্যয় ফেলায় পুলিশদের। সে সময়ের অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনীতির মূলস্রোত ছিল ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন।

৫.৪ কিশোর অপরাধ দমন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা

বাংলাদেশের পুলিশ কিশোর অপরাধ সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে থাকে। কিশোর অপরাধ সংশোধনের জন্য পুলিশ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে বয়েজ ক্লাব, ক্যাম্পাস এবং ক্রীড়া ও শারীরিক উৎকর্ষের কর্মসূচী সৃষ্টি করা অন্যতম। পুলিশ অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও যুদ্ধকালীন আপদের সময় পুলিশ civil defence হিসেবে কাজ করে। শত্রুর আক্রমণ হতে জনসাধারনের জীবন সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পুলিশ সরাসরি জনসেবার জন্য কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ

পুলিশের মৌলিক কাজ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা। এইসব কাজ করতে গিয়ে পুলিশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনসহ নানা ধরনের অপরাধের মোকাবেলা করতে হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও পুলিশকে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে হয়। পুলিশ তার সামগ্রিক দায়িত্ব পালনে কখনও সফল কখনও ব্যর্থ হয়েছে। তবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে পুলিশকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।[১০] অবশ্য এখানে অপরাধ, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রোধে পুলিশের কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আলোচিত হল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের ডাকাতি সংঘটিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাকাতি করার কোন আলামত, রেকর্ড ও সাক্ষী পাওয়া যায় না। কারন ডাকাতদল নানা ধরনের লোমহর্ষক কাহিনী উপহার দিয়ে চৌকিদার, পঞ্চায়েত ও সাক্ষীদের মনে দারুন ভীতি সৃষ্টি করেছিল। ডাকাতি করার সময় কোন বাঁধা পেলে বাঁধাদানকারীকে ডাকাতদল জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। তাই তাদের বিরুদ্ধে কেউ আদালতে সাক্ষীও দিতে আসত না। ১৯০২ সালে ঢাকায় এক ম্যাজিস্ট্রেট এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ডাকাতদল তাদের ভয়ংকর কার্যকলাপ দ্বারা প্ররোচিত হত। তাদের নাম ও চরিত্র সম্পর্কে সবল জানত। কিন্তু কেহ তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রদান করত না এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাদের এ কারনে দোষীও সাব্যস্ত করতে পারতেন না।[১১] তাই প্রকৃত ডাকাত ধৃত হবার পরও বিচারক উপযুক্ত সাক্ষী ও তথ্য প্রমানাদির অভাবে তাদের খালাস দিতে বাধ্য হতেন। আর সাক্ষী বা প্রত্যক্ষ দর্শীরা প্রাণের ভয়ে এহেন কাজ থেকে বিরত থাকতো। ফলস্বরূপ ডাকাতদল আইনের ফাঁকে পার পেয়ে যেত।

---

১০. Paul G. shane, *Police and People*, p. 89.

১১. N.A Razvi, *Op, cit.* p.155.

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের ঘটনা ১৯০০ সালের পরের দিকে ঘটতে থাকে। ১৮৮০ সালে সিলেটে টৌয়ানদীতে জলদস্যুবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এই অঞ্চলের একদল জলদস্যু। এই ঘটনার ১০ বছর পর এই জলদস্যুর ছেলেরা মকবুল খানের নেতৃত্বে আবার মাঠে নামে। তারা নিজস্ব নৌকায় জলদস্যুবৃত্তি পরিচালনা করতো। মকবুল তার অপকর্মের জন্য চারবার গ্রেফতার হলেও প্রত্যেকেবারই সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এরপর ১৯০৩ সালে তিনি নদীতীরবর্তী ছোট গ্রামগুলোতে আক্রমণ করতে থাকে। পরে অবশ্য পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়। তদন্তে প্রমানিত হয় তার গ্রুপে ২০০ সদস্য ও সহযোগী আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বাৎসরিক ডাকাতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০টি আর ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০০টি।[১২] আসলে ১৯০০ সালের প্রথমদিকে পুলিশী তৎপরতা পরিলক্ষিত হলেও উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমানের অভাবে বিচারে অপরাধীদের অনেকেই খালাস পেয়ে যেত এবং পরবর্তীকালে আবার অপরাধীরা অপতৎপরতায় জড়িত হতো। ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রায় অপরাধ কর্ম অব্যাহত ছিল।

পুলিশী তৎপরতা সত্ত্বেও বিশেষ করে ১৯০৪ সালে বরিশাল জেলায় চুরি-ডাকাতি গুরুতর আকার ধারন করে। দেশের বিভিন্ন আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এবং পাশাপাশি পুলিশী কার্যক্রমের মধ্যেও এ ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ সাফল্য অর্জন করেছিল।[১৩] ১৯০৪ সালে পুলিশ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা গ্রহণ করলেও অবস্থার পরিবর্তন আসেনি সন্তোষজনকভাবে। কেননা এই বছরে (১৯০৪) টাঙ্গাইলে দস্যুবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। এবং দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে ছিনতাই হচ্ছিল।[১৪]

১৯০২-০৩ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের পুলিশ কমিশন গঠিত হবার পর ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশকে বিভক্তকরণ নিয়ে রাজনৈতিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোট নাগপুর নিয়ে অবিভক্ত বাংলা গঠিত ছিল। ৭,৮৯,৯৩০০০ লোকসংখ্যা অধ্যুষিত বিশাল এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনা করা দুরূহ ছিল। তাই লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন।[১৫]

---

১২. *Ibid.* pp. (155-156)

১৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৯০৪ইং, ২৬ বৈশাখ, ১৩১১ বাংলা।

১৪. ঐ, ১৯ জুন, ১৯০৪।

১৫. M. K. U. Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam 1905-1911*, p.1.

Dhaka University Institutional Repository

আসলে এই বিভক্তিকরণ কর্মটি ছিল প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। তাই এই বিভক্তির মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সৃষ্টি হয়।[১৬] বাংলা বিভক্তির ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই ক্ষিপ্রতা তৎকালিন রাজনৈতিক অঙ্গনকে সংঘাতের দিকে উস্কে দেয়। ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতে থাকে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় পর্যায়ক্রমে তা স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। আর একই সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছিল স্বরাজ আন্দোলন। তাই ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্যাবলীকে সংসদীয় কার্যাবলীর পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলে মনে হয়।[১৭] এই সময় পুলিশ সরকারি নির্দেশে পরিবেশ পরিস্থিতি রক্ষার জন্য যে কাজ করে তা প্রকারান্তে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে এবং আন্দোলনের বিপক্ষে যায়।

পুলিশের কাজের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা প্রকাশের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছে, তার মারফত জানা যায় যে বঙ্গের বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেফতার করে নেয় এবং বরিশালের হাকিম চারশত টাকা জরিমানা করে।[১৮] বরিশালের এই অধিবেশনে যোগদানের সময় হিন্দু প্রতিনিধিরা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি করে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে পুলিশ বঙ্গভঙ্গকে বাস্তবায়ন করার স্বার্থে নির্যাতন চালায়। তারপরেও বঙ্গভঙ্গের বিষয়ে এই অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যতদিন পর্যন্ত বঙ্গবঙ্গকে রহিত করা না হয় বা হেনরিফটনের প্রস্তাব (বঙ্গভাষীকে একশাসনাধীনে রাখা) গ্রহণ করা না হয়, ততদিন আন্দোলন চলবে।[১৯]

---

১৬. Government of Bengal, *Report of the Administration of Bengal 1905-06*, p.II.

১৭. *special consolidated Indices of the proceedings of the imperial, Bengal and Eastern Bengal and Assam Legislatives councils*, Relating to Acts from 1862 to 1914 August, pp(207-10).

১৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ এপ্রিল, ১৯০৬.

১৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ এপ্রিল, ১৯০৬.

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এই সময় সমগ্র ভারতে বিলেতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়। তা সত্ত্বেও নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের শাসন প্রণালী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় হিন্দু সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরে অবশ্য পুলিশ হিন্দু সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা রোধে উদ্যোগী হয়। ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহে পুলিশ কনষ্টেবলগণ আইন-কানুন উপেক্ষা করে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর লাঠি চার্জের মত অত্যাচার চালায়। এছাড়া ময়মনসিংহের মুক্তগাছায় হিন্দু হরিসংকীর্তন সভায় আক্রমণ করে পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিনজনের বেশী একত্রে জোটবদ্ধ না হওয়ার জন্য সরকারি আদেশ জারি করা হয়।[২০] বঙ্গভঙ্গের ফলে চরম অশান্তি বিরাজ করতে থাকে। কারণ হিন্দু সম্প্রদায় মরিয়া হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতে থাকে। ইংরেজ সরকারও বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের দমনে সোচ্চার ছিল। এই সময় বি. ফুলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য আন্দোলনকারীদেরকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করার জন্য পুলিশকে আদেশ দেন।[২১] বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হয়, সারাদেশে আর্থিক দুর্গতিও দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় ফরিদপুর ও বরিশালে ঘন ঘন হৃদয় বিদারক কাহিনী ঘটে। বঙ্গভঙ্গের প্রভাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকেও আক্রান্ত করে। এই সময় ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবীগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। তাই লর্ড মর্লে ও লর্ড মিন্টো ১৯০৯ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল বিল' ১৯০৯ পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন এবং তা পাশ হয়। এতে সংসদের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সদস্যগণ সংসদে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারতেন না।[২২]

---

২০. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ জুন,১৯০৬

২১. *ঐ*, ১৭ জুন, ১৯০৬

২২. *Report of the Indian Constitutional Reformes 1918*, chap. IV, para-85.

Dhaka University Institutional Repository

আসলে ঔপনিবেশিক সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখা। আর সরকারি আদেশ বাস্তবায়নের পাশাপাশি পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করতো। ঢাকা প্রকাশ থেকে জানা যায় ১৯০৭ সালে ঢাকার কুমারটলীস্থ জনৈকা বারবনিতার বিনোদন ভবনে এক খদ্দের বিনোদনরত ছিল কিন্তু এমন সময় বাইরে থেকে হঠাৎ একজন এসে পুলিশের দারোগা পরিচয় দিলে উপস্থিতগণ বিচলিত হন। পরে ২০ টাকা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে আপোষ রফা হয়। কিন্তু বিদায়পর্বে ভাগ্যক্রমে প্রকৃত দারোগা সেখানে উপস্থিত হন। ফলে পূর্বে পরিচয় দেয়া দারোগা ভূঁয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়।[২৩] এটি একটি সাধারন ঘটনা হলেও এর মাধ্যমে পুলিশী কার্যকলাপ ও তার চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। আরো ধারনা পাওয়া যায় যে, পুলিশের কবলে পড়লে তা থেকে উদ্ধারের জন্য পুলিশকে উৎকোচ প্রদান করতে হত। জনগণের মধ্যে এ ধারনা বদ্ধমূল ছিল টাকা প্রদানের মাধ্যমে যে কোন অপকর্মে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

সরকার বিরোধী বিভিন্ন দাঙ্গা ও পদক্ষেপ দমন করার জন্য পুলিশ ব্যবহৃত হত। ফলে পুলিশের কার্যাবলী নানাভাবে সমালোচিত হতে থাকে। ১৯১০ সালের "বয়কট দিবস" বিক্ষোভ ছাড়া পালিত হয়। পুলিশকে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলাকারি গ্রুপের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালাতে হয়েছে। তাদের দমনে পুলিশ সাহসীমূলক অভিযান প্রেরন করে এবং দায়িত্ব পালনের সময় অনেকে নিহত হন। ১৯১৩-১৪ সালে এরূপ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কলিকাতার কলেজ স্কয়ারে একজন এবং অপরজন ময়মনসিংহে বোমায় নিহত হন।[২৪] ১৯১৪ সালে সেপ্টেম্বরে কলকাতায় Budge-Budge Riot সংঘটিত হয় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন চলে লিফলেট সরবরাহের মাধ্যমে। তবে এই সময় বড় ধরনের দাঙ্গা দমনে মিলিটারি ব্যবহার করা হয়।[২৫]

---

২৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭

২৪. *Report on the Administration of Bengal*, 1913-1914, Para-75.

২৫. *Report on the Administration of Bengal*, 1914-15, Para-25.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পুলিশী অত্যাচারের উদাহরণ উল্লেখ আছে। ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের কেন্দুয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর এবং কতিপয় কনস্টেবলের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে নেত্রকোনার সাব-ডিভিশনাল অফিসার বিচারের রায়ে সাব-ইন্সপেক্টরকে চাকুরি হতে অব্যাহতি দানের এবং কনস্টেবলদের চারিমাস কারাবাসের আদেশ দেন।[২৬] পুলিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রশমিত করার পাশাপাশি সমাজের নানাবিধ অপরাধ দমনেও সক্রিয় ছিল। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের কতিপয় জিলায় সংঘটিত নানাবিধ অপরাধ যথা দাঙ্গা, খুন, দন্ডনীয় অপরাধ, ডাকাতি ও সিঁদচুরির খতিয়ান নিচের সারণিতে প্রদত্ত হল ঃ

সারণি-১২

কতিপয় জিলায় ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, দন্ডনীয় অপরাধ, ডাকাতি ও সিঁদচুরির সংখ্যা ঃ

জিলা	দাঙ্গা		খুন		দন্ডনীয় অপরাধ		ডাকাতি		সিঁদচুরি	
	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৩	১৯১৪
বগুড়া	২৩	৩৩	১০	১৫	২	২	৫	৮	১৩৩০	১২৯১
খুলনা	৫১	৫০	১৭	২০	৫	৭	৩	৫	১১০১	১০৯১
ঢাকা	৬১	৬১	২৪	৩৫	১০	১০	৮	১৪	২৭৬১	২৫৬০
ময়মনসিংহ	৫৮	৭২	৪৪	৩৮	১০	১১	১২	৮	৪৫৫৫	৪৫৫২
ফরিদপুর	৮৮	৪৪	১২	১৫	১৬	৩৪	৪	৫	১৫৯৫	১৫৯১
বাকেরগঞ্জ	৬২	৫০	৪৪	৩৯	২৯	২৬	২৩	১	১৯৭৯	১৮০৮
চট্টগ্রাম	১৭	১৬	৪	৬	২	২	২	৭	৬০৭	১০০২
নোয়াখালী	১৬	১২	৪	১০	-	-	-	৭	৩৯৬	৩৮৭
রাজশাহী	২৭	২৪	৯	১১	৯	১৭	৩	১৮	১০৭৫	১০৩০
দিনাজপুর	২২	০৬	১২	১৫	৯	১৮	৬	৭	১১২২	৯০৬
রংপুর	২১	১৪	১১	১২	৭	৮	৭	৭	৭৫৬	৬৫৮
২৪ পরগণা	৫৪	৪৮	১৮	২২	২২	১৭	২৪	২১	২০৫০	২০৭২
মোট	৪৮০	৪৩০	২১২	২৩৮	১২১	১৫৫	৯৭	১০৮	১৯৫২৭	১৮৭৪৮

উৎস ঃ *Report on the Police Administration in the Bengal presidency* 1914, p.13.

২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ মে, ১৯১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সারণির পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৯১৩ সালে সংঘটিত মোট দাঙ্গার সংখ্যা চেয়ে ১৯১৪ সালে সংঘটিত দাঙ্গা সংখ্যা কম ছিল। তবে, যশোহর, খুলনা ও ময়মনসিংহ জিলায় আলাদাভাবে দাঙ্গাসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নতির দিক নির্দেশ করে। আবার খুন, দন্ডনীয় অপরাধ ও ডাকাতির সংখ্যা ১৯১৩ সালের তুলনায় পরবর্তী বছরে বৃদ্ধি পায়। তবে সিঁদচুরির সংখ্যা ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯১৪ সালে কিছুটা কমে ছিল। যাহোক, অপরাধচিত্রের এই সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দ্বারা পুলিশের কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক কোন মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে, এটা অনুমান করা অনুচিত হবে না যে, আলোচিত সময়ে পুলিশের কার্যাবলীর স্বাভাবিক গতি অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যাকে পরোক্ষভাবে পুলিশের কার্যাবলীর সফলতা হিসেবে উল্লেখ করা চলে।

পরবর্তীকালে ১৯১৫ সালের দিকে ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য বাকেরগঞ্জ জিলায় ডাকাতি এবং অপরাধের মাত্রা এমন পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে তা দমনের জন্য একটি Special Commission under the Defence of India Act গঠন করতে হয়েছিল।[২৭] এই পরিস্থিতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ভারতীয়দের অবদান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডে প্রশংসা লাভ করে। ফলে, ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের পক্ষে একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯০৯ সালের আইনের পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলা হলে সে প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯১৯ সালের এ আইন পাশ হলেও তা ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

---

২৭. *Report on the Administration of Bengal* 1915-16, para-75.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এইসব আন্দোলন দমনে সরকারকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। আর বাংলায় এই আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ১৯২০-১৯২২ সালের দিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবী রাজনীতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় গোপন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি" কংগ্রেস বিরোধী হলেও এই সময় এর সদস্যবৃন্দ নিষ্ক্রিয় ছিল।[২৮] তারপরও ১৯২৩ সালের সশস্ত্র আন্দোলনে এক পর্যায়ে কলকাতায় শাখারি টোলা ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার নিহত হন।[২৯] ১৯২৪ সালে দিনের বেলায় গোপীনাথ সাহা নামে একজন কলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মিঃ ডেকে হত্যা করেন। অবশ্য খুনের আসামী গোপীনাথ আদালতে তার ভুলের কথা স্বীকার করেন। সাহা ভুল করে ডেকে হত্যা করেন। আসলে তার হত্যা করার কথা ছিল পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে।[৩০] অবশ্য গোপীনাথ সাহার মৃত্যু বিপ্লবীদেরকে নিরুৎসাহিত করেনি।

১৯২৪ সালে অবশ্য পুলিশ ফরিদপুর ও কলকাতার মানিকতলায় বোমা তৈরীর কারখানা উদঘাটন করে। ১৯১৬-১৭ এর দিকে পুলিশী কার্যাবলী মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও ১৯১৮-১৯ সালের দিকে কতিপয় পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। মোটের উপর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল এই সময়।[৩১] তবে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড একেবারে বন্ধ ছিল না। গুলিভর্তি পিস্তলসহ একজন জুলাই মাসে কলকাতায় রাজপথে গ্রেফতার হন।[৩২] এই মাসের শেষের দিকে কিছু পুস্তিকা প্রচারিত হয় যার নাম ছিল 'লাল বাংলা'। এই পুস্তকে আইন শৃঙ্খলার রক্ষক কিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়। এই পুস্তক থেকে পুলিশ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও জানা যায়।[৩৩] এই ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য পুলিশ সরকারি নির্দেশ মোতাবেক গ্রেফতারি প্রক্রিয়া চালাতে থাকে।

---

২৮. Gopal Halder, *"Revolutionary Terrorism,"* in Autul Chandra Gupta (ed), studies in Bengal Renaissance, Jadavpur, The National Council of Education, Bengal, 1958, p. 249.

২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস*, পৃঃ ২৭৫।

৩০. ঐ, পৃঃ (২৭৩-২৭৪)

৩১. *Report on the Administration of Bengal* , 1918-19, para-74.

৩২. *Report on the Administration of Bengal* ., 1923-24, pp.(VIII-IX).

৩৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২ নভেম্বর, ১৯১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এইসব সন্ত্রাসমূলক কাজ দমনে পুলিশকে অবশ্যই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অন্য একটি কর্ম ঘটে, তা হলো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রতিহত করতে গিয়ে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। এছাড়া এইসব আন্দোলন দমন করতেও সরকারকে "ক্রিমিনাল ল" এ্যামেন্ডমেন্ট বিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করতে হয়।[৩৪] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। অবশ্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গ্রেফতারের ফলে সাময়িকভাবে ভাটা পড়ে।

তারপরেও ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিলে-চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণের ঘটনা ছিল বিপ্লবীদের জন্য খুব সাফল্যজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাটি ছিল বেশ বিস্ময়কর। খাঁকি পোষাক সজ্জিত, সামরিক কায়দায় অস্ত্র-শস্ত্র, নানা যুদ্ধোপকরণও মোনার সাহায্যে রাতে সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রামের ইউরোপীয় আবাসস্থল এবং বিভাগীয় সদর কার্যালয়ের ওপর আক্রমণ করে। একইসঙ্গে পুলিশ অস্ত্রাগার, অক্সিলারী ফোর্স এর সদর দফতরের অস্ত্রাগার এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ওপর আক্রমণ চালান হয়। রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ট্রেনকে ধ্বংস করা হয়। টেলিফোন অফিসের সুইচ বোর্ড ভেঙে টুকরো করা হয় এবং বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এ আক্রমণে অক্সিলারী ফোর্সের অস্ত্রাগারের দু'জন প্রহরী, দু'জন সার্জেন্ট মেজর এবং আরো চারজন নিহত হন। অস্ত্রাগার বল প্রয়োগ করে খোলা হয় এবং পিস্তল,রাইফেল এবং একটি লুইস গান চুরি করা হয়; বাড়ীটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশ লাইনে প্রহরীকে হত্যা করা হয়। অস্ত্রাগার জোর জবরদস্তি করে খোলা হয় এবং মাসকেট্স রিভলবার এবং কার্তুজ, গোলাবারুদ লুঠ করা হয়। বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর এ সুসংহত ও সুশৃঙ্খল দল একত্রিত হয়ে ফুচকাওয়াজ করে চট্টগ্রামের চারপাশের জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চলে যায়।[৩৫]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান হোতা ছিলেন বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেন। তার নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এ কাজ সংঘটিত হয়। পরে ১৯৩৩ সালে সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর বিচারে তার প্রাণদন্ড হয়। ১৯৩১ সালে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুজন মহিলা কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট সি. জি. বি স্টিভেনসকে হত্যা করে।[৩৬]

---

৩৪. David M. Laushey, *Bengal Terrorism and Marxist Left*, p. 29.

৩৫. স্যার চার্লস টেগার্ট, *ভারতে সন্ত্রাসবাদ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা-নন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ (২৬-২৭)

৩৬. ঐ, পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

এরপরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউটের ওপর আক্রমণ সংঘটিত হয়। এটি ঘটে ১৯৩২ সালের রাত দশটায়, যখন রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে তাস খেলা চলছিল। সন্ত্রাসবাদীরা বোমা, রিভলবার এবং বন্দুক নিয়ে তিন দিক থেকে ঐ প্রাঙ্গন আক্রমণ করে। ফলে একজন ইংরেজ রমণী নিহত হন এবং চারজন মহিলাসহ এগারজন অতিথি আহত হন। পরে অবশ্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন এবং তার মৃতদেহ বাড়ীটির বাইরে পাওয়া যায়।[৩৭]

বিপ্লবীদের এ সাফল্য চূড়ান্ত রূপ না পেলেও তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। ৩০ আগষ্ট, ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহে গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর ও শুল্ক সাব-ইন্সপেক্টরের বাড়ীতে বোমা হামলা হয়। ২৯ আগষ্ট ঢাকায় লোম্যান নামে একজন ইংরেজকে হত্যা করে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বিনয়। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কর্নেল সিম্পসনকেও হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র ১৯৩০ সালে ১১ জন ইংরেজ কর্মচারি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয় আর আহত হয় আরো ১২ জন।[৩৮] এরপূর্বে ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় প্রায় ২০০টি সন্ত্রাস সংঘটিত হয় এর মধ্যে ১০১টি পদক্ষেপ ছিল বিপ্লাবাত্মক এবং এর সাথে জড়িত ছিল ১০৩৮ জন বিপ্লবী।[৩৯] মোট কথা ১৯০৫ সালের পর থেকে পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে সহিংস দাঙ্গা, আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধ করতে। বিপ্লবী কর্মকান্ড অবশ্য ১৯৩১ সালের পরেও চলতে থাকে ইংরেজদের হত্যার মাধ্যমে। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসক গুলিবিদ্ধ হন এবং ২৭ জুলাই চব্বিশ পরগনার দায়রা জর্জ গ্যারলিক নিহত হন। ইন্সপেক্টর আহসানুল্লাহ নামে একজন সরকারি কর্তা যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বিচার পরিচালনায় সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন– তিনি চট্টগ্রামে নিহত হন।

১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে একজন মহিলা গ্রাজুয়েট গভর্নর ষ্টানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করে।[৪০]

---

৩৭. ঐ, পৃঃ ২৮

৩৮. *Joint Committee on Indian Constitutional Reform*, p. 342.

৩৯. N.A. Razvi, *Op. cit.* p. 173.

৪০. *Report on the Administration of Bengal,-1923-24*, p. XV

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় দেশে দারুন প্রশাসনিক বিপর্যয় দেখা দেয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের হামলা ও আক্রমণে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভীত হয়ে পড়ে। ১৯০৩ সালে হিজলী বন্দী শিবিরে নিরস্ত্র রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর গুলি ছোড়া হয় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে। এই গুলিতে রাজবন্দী তারেকশ্বর ও সন্তোষমিত্র নিহত হলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারন করে। তাই, কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট আরো কঠোর করতে বাধ্য হয়। এই আইনের ফলে বিপ্লবীদের, তাদের সমর্থনকারিদের বা সহযোগীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়। ফলে, ১৯৩৩ সালের দিকে অসংখ্য বিপ্লবী নেতা গ্রেফতার হয় এবং অনেক গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। ফলে বিপ্লবী আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৪১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ বৃটেন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত কোন আলোচনা ছাড়াই ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে খর্ব করে গভর্নর জেনারেলকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা দান করে। ফলে, ভারতীয় জনগণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস এ যুদ্ধকে তাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। এ অবস্থায় ভারতীয় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ মিলে যুদ্ধ পরামর্শ দান পর্ষদ গঠন করে। এরপূর্বে ১৯৪০ সালে হিটলারের আক্রমণে ফ্রান্সের পতন হলে বৃটেন ও হিটলারের আক্রমণের মুখে পড়ে। এ সময় কংগ্রেস ব্রিটিশকে শর্তাধীনে সহযোগিতার আশ্বাস দিলে ব্রিটিশ তা প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানে 'ক্রিপস মিশন' প্রেরণ করলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই 'ক্রিপস প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করে। এ সময় কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত থেকে ব্রিটিশদের ত্যাগ করার জন্য এক প্রস্তাব পাশ হয়। এরপর ভারতের স্বাধীনতার জন্য শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম শুরু হলে গান্ধীসহ কংগ্রেসের নেতারা গ্রেফতার হন।

সারা ভারতের ন্যায় বাংলার সকল জেলাতে এ আন্দোলন চলতে থাকে। তবে, বাংলায় মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলনের তীব্রতা ছিল বেশী। এমনকি মেদিনীপুরে প্রায় দেড় বছর ধরে ইংরেজ শাসন অনুপস্থিত ছিল।[৪২]

---

৪১. *Report on the Administration of Bengal*,-1932-33, pp (XXV-XXVI)

৪২. শওকত আরা হোসেন, *বাংলার রাজনীতি ও ব্যবস্থাপক সভা (১৯৩৭-১৯৪৩)*, পৃঃ (১১-১৩)

Dhaka University Institutional Repository

মেদিনীপুরের এ অবস্থা অবসানে ব্রিটিশ সরকার পুলিশী নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। আর পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ-(১) পুলিশ বিরানব্বই জনকে গুলি করে হত্যা করে। (২) ত্রিশ জনকে পিটিয়ে হত্যা করে। (৩) তিনশত পঁচিশটি বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়। (৪) দুইশত জন মহিলাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। (৫) দশ হাজার লোককে আটক করা হয়। (৬) পাঁচ হাজারের অধিক বাড়ী লুট করা হয়। (৭) চল্লিশ হাজারের অধিক বাড়ি তল্লাশী করা হয়। (৮) একশটির অধিক বাড়ী জোর করে অধিকার করা হয়। (৯) একশটির অধিক প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়।[৪৩] অবশেষে মেদিনীপুর জিলা ঝড়ের কবলে পতিত হলে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর এ অবস্থায় সরকার কোন সাহায্য সহযোগিতা না করে বরং পুলিশের মাধ্যমে কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে। পুলিশকে সরকার এক্ষেত্রে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

পুলিশকে বরাবর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনে ব্যবহার করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের হরতাল প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও। আগস্ট মাসের এ হরতালে স্কুল, কলেজ, দোকান পাট বন্ধ থাকে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিক্ষোভ ও সভা-সমাবেশ ছিল প্রাত্যাহিক ঘটনা। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে সংগ্রামরত জনতার ভাগ্যে জুটে পুলিশের লাঠি ও বন্দুকের গুলি। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে যা পুলিশী নির্যাতনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বগুড়া, মালদহ, নদীয়া, বরিশাল, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দিনাজপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানেও জনসাধারণ এ ধরনের আন্দোলন চালাতে থাকে। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন অবদমনে পুলিশের নির্যাতনের মাত্রাও ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়।[৪৪] পরিশেষে এসব আন্দোলন ব্যর্থ হয়। অবশ্য 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন নেতা বা রাজনৈতিক দলও সমর্থন করেনি।

বিপ্লবী সংগঠনের সকলেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাই মুসলমানগণ এই আন্দোলনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। ফলে, তারা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণেও আগ্রহ দেখায় নি, কারণ এইসব আন্দোলনে প্রবীন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত ছিল। এছাড়া আন্দোলনকারি বিপ্লবীদের প্রতি মুসলমানদের ধারণা দুটি কারণে বিরূপ ছিল-

(১) বিপ্লবীরা ছিলেন মুসলমান বিরোধী, হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে আগত। বিপ্লবীদের মধ্যে কোন মুসলমান ছিল না।

৪৩. ঐ, পৃঃ ৪৭, উদ্ধৃত *Gopinanda Goswami, "August Revolution in Medinipur* (1942-44)".
৪৪. ঐ, পৃঃ (১৩-১৪)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(২) ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯২৩ এর বেঙ্গল প্যাক্ট রদের জন্য বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা সে যুগের মুসলমানদের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।[৪৫] আসলে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল ধর্ম। বিপ্লবীদের চেতনা হিন্দু ধর্মের কালি দেবীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। সন্ত্রাসী আন্দোলনের সদস্য হবার শর্ত ছিল কালিমন্দিরে কালিদেবীর নামে শপথ গ্রহণ করা। যা মুসলমানদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। উচ্চ হিন্দু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করত। গুপ্ত সমিতি ও অনুশীলন সমিতি একচ্ছভাবে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে মুসলিমদের বিরত থাকার অন্য কারণ ছিল কোরআনের নির্দেশ। কোরআনে জিহাদের কথা বলা হলেও সন্ত্রাস বা ফ্যাসাদ থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়। আর ভারতে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসীরা এক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের) অধীনে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করে।[৪৬]

401279

এসব কারণে মুসলমান সম্প্রদায় এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এরপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনও ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাংলাকেও প্রভাবিত করেছিল স্পষ্টভাবে। পরিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু তারপূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন দমনে পুলিশকে ব্রিটিশ শক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে হয়েছে। এর প্রতিফলন ঘটে নিম্নোক্ত বক্তব্যে "The police forces were used by British in the struggle against the movement for independence."[৪৭] তা সত্ত্বে পুলিশ সমাজের বিভিন্ন অপরাধ দমনে সবসময় কমবেশী ভূমিকা পালন করেছে। আলোচনায় সুবিধার জন্য এখানে ১৯২০ এর দশক এবং ১৯৩০ এর দশকের বিভিন্ন অপরাধ চিত্রের খতিয়ান বিশ্লেষণ করা হল। পূর্বে ১৯১০ এর দশকের অনুরূপ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিচের সারণিতে ১৯২০ ও ১৯২১ সালে বাংলার কয়েকটি জিলায় সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি এবং সিঁদচুরি ও গরুচুরির খতিয়ান দেয়া হল। এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তৎকালিন বাংলাদেশের অপরাধ চিত্রের একটা সাধারণ ধারনা পাওয়া সম্ভব। এর সাথে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে পুলিশী দায়িত্বও জড়িত। ফলে এই তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুলিশের কার্যাবলীর মানদন্ডের একটা সাধারন পরিমাপও সম্ভবপর।

---

৪৫. ঐ, পৃঃ ৩৫.

৪৬. Dr. Mohammad Shah, *'Terrorism in Colonial Bengal : The Muslim Response.'* (Paper read at the Asiatic society of Bangladesh, December, 2000.)

৪৭. Paul shame, *Police and people*, p. 89.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৩
১৯২০ ও ১৯২১ সালে কতিপয় জিলায় সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, সিঁদচুরি ও গরুচুরির খতিয়ান ঃ

জিলা	দাঙ্গা		খুন		ডাকাতি		সিঁদ চুরি		গরু চুরি	
	১৯২০	১৯২১	১৯২০	১৯২১	১৯২০	১৯২১	১৯২০	১৯২১	১৯২০	১৯২১
যশোহর	১০	১৪	৯	১৪	৬	৭	১৪৪৬	১৩৩৯	৪৫	৪৫
খুলনা	৯	২২	১৯	২৫	১২	১৬	২০৮৯	১৬৬০	৩৯	৪৬
রাজশাহী	৬	১৯	১২	১২	১৭	২৮	১২৬৫	১২৩৩	২১	১৮
দিনাজপুর	১০	১৯	১১	১৬	২৫	৩৮	১৫০৫	১৩৮১	৪৬	৭৪
রংপুর	৩৬	৪৪	১৩	১৭	৪৭	৭৪	২৬৭৮	১২৫২	২৩	২৮
বগুড়া	৮	১০	১১	৮	১৭	১৯	১১৯৭	৬৯২	২৪	১২
ঢাকা	২৮	২৮	২৬	২৭	১৭	৩৩	৩৭৮২	২৮৬৯	৪৬	৩৭
ময়মনসিংহ	৮১	৭৬	৬১	৫৪	৩৩	২৫	৫৪৩৭	৪৫৭৫	৫২	৫৩
বাকেরগঞ্জ	৬৪	৬৩	৩৪	৪২	২৭	২৩	৩৬৯৪	৩০৪৮	৮৮	৭০
ফরিদপুর	৫১	৫২	২৩	১২	১১	১২	১৪৫৮	১৪৪২	১৮	৩০
নোয়াখালি	৩	৪	৭	৫	-	১	৮১৪	৮৯২	১৫	১৬
চট্টগ্রাম	৯	১৩	৬	৫	৫	২	৮৫০	৮৩১	১৬	১২
মোট	৩১৫	৩৬৪	২৩২	২৩৭	২১৭	২৭৮	২৬২১৫	২১২১৪	৪৩৩	৪৪১

উৎস ঃ *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1921*, p. 26.

উক্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দাঙ্গার সংখ্যা ১৯২০ সালের তুলনায় ময়মনসিংহ ও বাকেরগঞ্জ ছাড়া বাকী জিলাগুলোতে বেড়েছে বা অপরিবর্তিত রয়েছে। আর দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে কেবল পুলিশী দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা প্রমান করে না। কারণ দাঙ্গা বৃদ্ধির পশ্চাতে রয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা এবং জাতিগত বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা। আর এর সাথে মনুষ্য নৈতিক মূল্যবোধও জড়িত। তবে দাঙ্গায় সংখ্যা আবার ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের তুলনায় কম ছিল। তবে, খুনের সংখ্যা যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দাঙ্গা বৃদ্ধির সাথে খুনের একটা আন্তঃসম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেসব জেলাতে দাঙ্গার সংখ্যা বেড়েছে খুনের সংখ্যাও ঐসব জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাকাতি সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও ঢাকা জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ ভাবে অনুমান করা যায় যে, ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে পূর্বের বছরের তুলনায় হয়তো বা অবনতির দিকে নির্দেশ করে। আর সিঁদ চুরির পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে প্রায় সব জেলাতে কমেছে। যা আইন শৃঙ্খলা উন্নতির দিকে নির্দেশ করে। তবে এর সাথে পুলিশের দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলীর যথার্থতা প্রমান করা

Dhaka University Institutional Repository

অনুচিত হবে। কেননা এই ধরনের অপকর্মের সাথে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ও সর্বোপরি আর্থিক অবস্থা জড়িত। তারপরেও সিঁদচুরির সংখ্যা হ্রাসকরণ ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে সামাজিক স্থিতিশীলতার কথা প্রমাণ করে।

১৯২০ ও ১৯২১ সালের প্রায় একদশক পরের অর্থাৎ ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ চিত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে সারণিতে দেয়া হল।

সারণি-১৪

১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত দাঙ্গা, খুন, ডাকাতি, সিঁদচুরি ও গরুচুরির খতিয়ান ঃ

জিলা	দাঙ্গা		খুন		ডাকাতি		সিদ চুরি		গরু চুরি	
	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩২	১৯৩৩
যশোহর	৫৪	৩৮	২৭	৩৭	৫৪	৪২	১৪৭২	১৫৩৯	৩২	৩০
খুলনা	৩৭	৩১	৩৮	৩০	৭৯	৬৩	১৩৭৭	৪৭৬	১২	১৭
রাজশাহী	২৫	১২	৯	১৩	৫০	৪৮	৬২৯	৬৫০	২২	১৭
দিনাজপুর	১৭	২৭	১৭	১৪	৮৯	৯৪	৬৬৮	৫৪৭	২০	১৬
রংপুর	৫৭	২৬	৩৩	৩১	৮৭	৬৩	১৮৯২	২০৬৩	৪০	২৬
বগুড়া	১০	১১	২৩	১৪	৫০	২১	৬৩৭	৬৩৩	১৬	১৩
ঢাকা	৮৪	৫৯	৪৫	৪৩	১৫৫	১১২	২৩৮৯	২৩০১	১৭	১৫
ময়মনসিংহ	১২৬	৯৫	৯৫	৮৫	১১৮	৫২	৩২৩০	২৮৬০	৩১	৪০
বাকেরগঞ্জ	৯৪	৫৬	৭৮	৫৫	১০৪	৬৪	১৮৭৯	১৫৪৮	৪১	৩৬
ফরিদপুর	৩৬	৩৮	২৫	১৯	৪৪	২৬	১১১৭	৮১২	২৪	১৮
নোয়াখালি	৩০	২৮	১৩	১২	১০	১২	৯৯৯	৬৭১	১৯	২০
চট্টগ্রাম	২৭	১৪	১৯	১৭	৭৫	৫১	৫৭৪	৫৫৫	৭	১৪
মোট	৫৯৭	৪৩৫	৪২২	৩৭০	৯১৫	৬৪৮	১৬৮৬৩	১৪৬৫৫	২৮১	২৬২

উৎস ঃ Report on the Police Administration in Bengal presidency for the year 1933, p. 17.

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দাঙ্গার সংখ্যা ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে প্রায় প্রতিটি জেলায় কমেছে (ফরিদপুর ছাড়া)। আর খুনের সংখ্যা প্রায় সব জেলায় কমেছে (যশোহর ছাড়া)। আবার ডাকাতির সংখ্যা অনুরূপভাবে দিনাজপুর ছাড়া প্রায় সব জেলাতে কমেছে। সিঁদচুরির সংখ্যাও সব জেলাতে ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে কমেছে। উক্ত পরিসংখ্যানের বিভিন্ন অপরাধচিত্রের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ১৯৩২ সালের তুলনায় তুলনায় ১৯৩৩ সালে সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত উন্নতির দিকে ছিল।

আলোচ্য অধ্যায়ে ১৯০০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অপরাধ চিত্র পর্যালোচনার জন্য তিনটি বিভিন্ন দশকের অর্থাৎ ১৯১০, ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকের কয়েকটি জিলার অপরাধ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত তিন দশকের মধ্যে ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২০, ১৯২১ এবং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২, ১৯৩৩ সালে দাঙ্গার সংখ্যা কমেছে। যদিও বা ১৯২০, ১৯২১ সালের তুলনায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরেও প্রথম অবস্থার তুলনায় শেষের দিকে দাঙ্গার সংখ্যা কমতে থাকে। অনুরূপভাবে ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২০ ও ১৯২১ সালের দিকে খুনের সংখ্যা হ্রাস পায়, অবশ্য ১৯৩২ ও ১৯৩৩ এর দিকে কিন্তু বৃদ্ধিও পায়। এই হ্রাস বৃদ্ধির হারের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমোন্নতির চিহ্ন বহন করে যা পুলিশী কার্যাবলীর ইতিবাচক তৎপরতার পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে। আর ডাকাতির সংখ্যা ১৯১২-১৯১৩-১৯১৪ এর দশকের তুলনায় ১৯২০-২১ এবং ১৯৩২-৩৩ এর দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আর্থিক অসচ্ছলতা, বেকারত্ব, জনসংখ্যার আধিক্যতা ইত্যাদি কারন জড়িত। এছাড়া এর সাথে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও সম্পৃক্ত। তাই, সামগ্রিক বিচারে এইসব পরিসংখ্যান দ্বারা পুলিশী কার্যাবলীর গুণগত মান সম্পর্কে অতি সামান্যই আঁচ করা যায়। তারপরেও এটা অনুমান করা যায় যে পুলিশ মোটামুটি সবসময় একই প্রকৃতির কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। যা পুলিশের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেছে পরোক্ষভাবে। তবে, পুলিশের অপকর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদির অভাবে যথার্থ সমালোচনা করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

৫.৬ উপসংহার

পুলিশের সার্বিক ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী দরকার ছিল। আর এমনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একই ধরনের মনোভাব পোষণ করত। পুলিশ এ সময় একটি ভয়ংকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের নিকট পরিচিতি লাভ করে। কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উপনিবেশ টিকে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার পুলিশকে দমনকারি হাতিয়ার, হিসেবে ব্যবহার করতো। এই বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় David H. Bayley এর নিম্নোক্ত মন্তব্যে "The Independence struggle pitted police against national movement, Indian Policeman against Indian freedom-fighter. Because the police bore the brunt of repressive activities, memories were planted in the minds of people that even today fundamentally affected relations between the two."[৪৮]

পুলিশের সামগ্রিক কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য জনকল্যাণ হলেও সরকার কর্তৃক চাপানো দায়িত্বের মধ্যে ভিন্ন গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। ইহা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যথার্থ অর্থেই ছিল একটি পুলিশী রাষ্ট্র।[৪৯] এ অবস্থায় পুলিশকে জনগণের পুলিশ বা জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত বলা যায় না।

---

৪৮. David H. Bayley, *The police and political Development in India*, p. 49.

৪৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, পৃঃ ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পুলিশ ও সিভিল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক

৫.১ সিভিল সমাজ

সিভিল সমাজের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক বিতর্ক হতে পারে। সিভিল সোসাইটি একেক দেশের প্রেক্ষিতে একেক ধরনের ব্যঞ্জনা পেতে পারে। সামরিক বাহিনীর বিপরীতে নিরস্ত্র মানুষের সমাজই হলো সিভিল সোসাইটি। রাষ্ট্রে, সমাজে নিরস্ত্র মানুষের কর্তৃত্বকেই মূলতঃ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] আসলে সিভিল সমাজ বলতে সমাজে বসবাসকারি জনগণকে বোঝায় যারা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে কিংবা আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপে জড়িত নয় এবং যারা সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 'সিভিল সোসাইটি' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক দার্শনিক থমাস হোবস (Thomas Hobbes) এর লেখায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সিভিল সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। সিভিল সমাজ বলতে আসলে সমাজের নিরস্ত্র লোকজনকে বুঝায়। আর বিচারপতি কে. এম. সোবহান সিভিল সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[২]

৫.২ পুলিশ ও সিভিল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক

পুলিশের কাজকর্ম সিভিল সমাজকে ঘিরে। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করাই পুলিশের মৌলিক কাজ। প্রকৃতপক্ষে পুলিশ ও জনগণ একই প্রজাতির আলাদারূপ। কারণ পুলিশ মাতৃগর্ভ থেকে পুলিশ হিসেবে জন্মায় না। সিভিল সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ও জনকল্যাণের স্বার্থে সিভিল সমাজ থেকেই পুলিশের জন্ম।[৩] তাই সিভিল সমাজের মূল্যবোধ, কৃষ্টি-আচরণ, ধ্যান-ধারনা ইত্যাদি পুলিশকে খুব বেশি প্রভাবিত করে।

---

১. মুনতাসির মামুন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুলাই, ২০০১ খ্রিঃ।
২. Muntassir Mamoon & Jayanta Kumar Ray, *Civil Society in Bangladesh Resilience and Retreat*, p. 9.
৩. দেলওয়ার হোসেন, *'পুলিশ ও জনগণ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* ডিটেকটিভ, ১২তম সংখ্যা, ১৫ জুলাই ২০০০, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও সভ্যতায় ভিন্নতা হেতু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পুলিশের আচরণেরও দারুণ বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। পুলিশকে তার দায়িত্ব পালনের স্বার্থে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সিভিল সোসাইটির সংস্পর্শে আসতে হয়। আবার পুলিশের কর্মদক্ষতা অনেকাংশে নির্ভর করে জনগণের সাথে অন্তরঙ্গতার ওপর ভিত্তি করে। আর এভাবেই পুলিশ জনগণের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অর্জন করে। কেননা যে কোন অপরাধের কারণ তদন্তের জন্য জনগণের সহায়তা প্রয়োজন হয়।[৪] বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ ধারা অনুযায়ী সেনা, নৌ ও বিমানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মূলতঃ একমাত্র পুলিশ বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হয় বিধায় 'পুলিশ ফোর্সকে' সিভিল ফোর্স হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই সিভিল ফোর্স হিসেবে ইউনিফরম পুলিশ ও জনগণের মধ্যে একটা আলাদা পরিচিতি ও সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।[৫]

সমাজের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা, আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা এবং জনশক্তি রক্ষার স্বার্থে পুলিশকে সিভিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মিশতে হয়। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পুলিশ জনগণের সাথে বা জনগণ তাদের নিজ প্রয়োজনে পুলিশের সান্নিধ্যে আসে। ফলে সম্পর্ক হয়ে ওঠে বহুমুখী। তাই Paul G. Shane পুলিশ-জনগণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন "The relationship of Police to People is generally found to be quite complex and multifaceted."[৬] বস্তুত পুলিশকে প্রতিনিয়ত জনগণের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং বহুবিধ সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

---

৪. W. R. Gourlay, *Op, cit.* p. 157.

৫. সালমা বেগম মুক্তা, *'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের পুলিশ'*, ডিটেকটিভ, ৩০ জানুয়ারি, ২০০০, পৃঃ ১৯।

৬. Paul G. Shane, *op. cit.* p. 3.

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জনগণের সাথে পুলিশের সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রকৃতপক্ষে জটিল ব্যাপার। কেননা এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের স্বল্পতার পাশাপাশি রয়েছে পক্ষপাতমূলক উপাদান যার ওপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়েছে। কেননা উক্ত সময়ে পুলিশ প্রশাসন প্রতিবেদনের তথ্যাদি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারাই প্রণীত। ফলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ দ্বারা সৃষ্ট নির্যাতনের খবর এসব প্রতিবেদনে ছিল অনুপস্থিত।

ব্রিটিশ শাসন আমলের পুলিশ ছিল সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ পুলিশের কার্যাবলী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হয়। ১৯০০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্য ভারতীয় জনগণ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নতুনরূপ লাভ করে। বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে থাকে। তাই, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও ব্রিটিশ বিরোধী কার্য অব্যাহত রাখে বিপ্লবীরা। এ উপমহাদেশ স্বাধীন করার জন্য তারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। আর ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনকে দমনের জন্য পুলিশকে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ফলে, জনগণ পুলিশের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এ ধরনের পুলিশী অত্যাচারের দৃষ্টান্ত কম নয়। ১৯০৩ সালে নাটোরের মহারাজা বাহাদুর বলেছিলেন "অন্যের কথা কি, মফঃস্বলের বড় বড় জমিদারকেও পুলিশের অত্যাচার হতে রক্ষা লাভের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইতেছে।"[৭] এ ধরনের বক্তব্য থেকে পুলিশী নির্যাতনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুলিশ কেবল সাধারণ শ্রেণীর জন্যই আতংক ছিল না। জমিদারগণও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

---

৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১লা মে, ১৯০৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালে বরিশালে পুলিশী নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। এই সময় বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়[৮] আগমন করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে তিনি ছাড়া পান।[৯] উল্লেখ্য যে, তিনি কোন ফৌজদারি অপরাধে জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি যে সমিতির অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে গিয়েছিলেন সেটি ছিল ব্রিটিশ প্রশাসন বিরোধী সংগঠন।

এ সভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কার্যক্রম আলোচিত হবার কথা ছিল। তাই পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বৈঠকে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত অটুট রাখার শপথ নেয়া হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনও বেগবান হয়ে ওঠে। এ সময় মাদারীপুরে (সেসময় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মহকুমা) স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে– স্কুল ছাত্রদের ওপর। তাই পুলিশ স্বদেশী আন্দোলন ও বিলেতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং নির্যাতনের পথ বেছে নেয়।[১০] অনুরূপভাবে পুলিশ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অত্যাচার চালাতে থাকে। ময়মনসিংহে পূর্ব সৃষ্ট উত্তেজনা ছাড়া পুলিশ কনস্টেবলগণ হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হানা দেয়। ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পন্ড হয়ে যায়।[১১] আর জনসমাবেশ বন্ধ করার জন্য তিনজনের বেশি একত্রে চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও বিপ্লবী কর্মকান্ড প্রতিহত করা। কিন্তু এসব ঘটনায় নিরীহ জনগণ পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়।

---

৮. সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সমধিক পরিচিতি হলেও প্রথম জীবনে (১৮৭১ সালে) আই. সি. এস হয়ে সিলেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। চাকুরিচ্যুত হবার পর মেট্রোপলিটন কলেজ, সিটি কলেজ, ফ্রি চার্চ কলেজ এবং পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের অন্যতম তিনি। কংগ্রেসের পুনা অধিবেশন (১৮৮৫) এবং আহমেদাবাদ অধিবেশন (১৯০২)-এ সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ এপ্রিল, ১৯০৬

১০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ এপ্রিল, ১৯০৬।

১১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ জুন, ১৯০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হলে ব্রিটিশ প্রশাসনিক চাপে পুলিশকে আরো বেশি মাত্রায় রুক্ষ হতে হয়। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি এ দু'জন বিপ্লবী কলকাতায় প্রাক্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশতঃ প্রখ্যাত উকিল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে বোমা মেরে হত্যা করে। পরে ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়। আর প্রফুল্ল ধরা পড়ার পর নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।[১২] বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত এ জাতীয় হত্যাকান্ড নিঃসন্দেহে সমর্থন যোগ্য নয়। তারপরও বলা যায় যে, বিপ্লবীদের মধ্যে এই হিংসাত্মক কর্মকান্ড সংঘটনের প্রেরণা ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালিন পুলিশ সম্ভাব্য ভবিষ্যত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যা প্রকারান্তে ভারতীয়দের নিকট অনেকক্ষেত্রে নির্যাতনের সামিল হয়ে ওঠে। এভাবে দেখা যায়, ১৯১০ সালের দিকে পুলিশী কার্যাবলী বিশেষ সমালোচনার বিষয় হয়ে পড়ে।

১৯১০ সালের পরে বিশৃঙ্খলাপন্থীদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে, বিপ্লবী ও অন্যান্য যারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের জড়িত করেছিল তারা পুলিশের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ কার্যকলাপ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় কলকাতা ও ময়মনসিংহে বোমার আঘাতে দুই জন পুলিশ নিহত হয়।[১৩] ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল বিল পাশ করা হয়। এতে ভারতীয়দের সামান্য ছাড় দেয়া হলেও মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের হাতে রাখা। যার প্রমান পাওয়া যায় পুলিশ ফোর্সকে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার ও অপব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এই সময় বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলে তা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় পুলিশ ফোর্সের মাধ্যমে। ফলস্বরূপ পুলিশ যত্রতত্র জনগণের প্রতি নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে জনগণের মনেও পুলিশের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সময় বিপ্লবী গ্রুপের সদস্যরা এবং

১২. স্যার চার্লস টেগার্ট, ভারতে সন্ত্রাসবাদ, অনুবাদ– সম্পাদনা – নন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬

১৩. *Report on the Administration of Bengal*, 1913-1914.

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পন্থী গ্রুপের সদস্যগণ নানা ধরনের গুপ্ত হত্যাকান্ড পরিচালনা করতে থাকে। আর এসব ক্ষেত্রে পুলিশকে টার্গেট করে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ১৯০৯ সালে আলিপুরে পুলিশ কোর্টে আশুতোষ বিশ্বাস নামে একজন পাবলিক প্রসিকিউটরকে খুন করা হয়, কারণ তিনি মানিকতলা-কেসের[১৪] ক্ষেত্রে সরকারি পক্ষে কাজ করেছিলেন। ১৯০১ সালের জুনে ফরিদপুরের প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডটি ঘটে ভুলবশত। কারণ এক্ষেত্রে টার্গেট ছিল তার ভাই গোবেশ যিনি পুলিশের ইনফরমার ছিলেন।

এভাবে, ১৯১০ সালে মানিকতলা কেসের যখন শুনানি চলছিল, তখন খান বাহাদুর শামসুল হক যিনি অপরাধ তদন্ত বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন, কলকাতার হাইকোর্টের বারান্দায় নিহত হন। তাঁকে হত্যার কারণ ছিল তিনি মানিকতলা কেসে তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যা বিপ্লবীদের জন্য খুব অশুভকর ছিল। একই বছরে ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগের ইন্সপেক্টর শরৎচন্দ্র গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন।[১৫] এসব হত্যাকান্ড ও হত্যাকান্ডের প্রচেষ্টা পুলিশের প্রতি ক্ষোভ ও হিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এ ছাড়াও ১৯১১ সালে কোলকাতায় শিরিষচন্দ্র নামে একজন হেড কনস্টেবল নিহত হন। তিনি পূর্বে যুগান্তর সংঘের সদস্য ছিলেন, ১৯০৮ সালে পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালে ঢাকায় রতিলাল রায় নামে আরো একজন হেড কনস্টেবল খুন হন।

---

১৪. সন্ত্রাসী ও বিপ্লবী কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কলকাতার মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে বিপ্লবীরা ভুলবশত ইংরেজ উকিল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে বোমা মেরে হত্যা করে। এই ঘটনার সংশ্লিষ্টতায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং প্রফুল্ল আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন দিলেও পুলিশী অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ফলে বারীনের বাগানবাড়ি আবিষ্কৃত হয়। এখানেই ষড়যন্ত্রকারীরা অস্ত্র ও বোমাসহ ধরা পড়ে। কলকাতার উপকণ্ঠে নিভৃত এই বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী নেতা বারীন ও তার শিষ্যরা নানা ধরনের অস্ত্র মজুদ রাখে এবং ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার আস্তানা হিসেবে এটি ব্যবহার করে। ১৯০৮ সালের এই ঘটনায় ৩৭ জনকে চালান দেয়া হয় বিচারের জন্য। দীর্ঘ একুশ মাস ধরে তিনটি আদালতে বিচার কাজ চলে। হাইকোর্টের রায়ে বারীন ও অপর তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। দীর্ঘ বিচারকার্য চলার সময় বিপ্লবীদের দ্বারা নানা হত্যাকান্ড চলতে থাকে যাতে বিচার কাজে সহায়তাকারীরা বিরত থাকে। এই কেস মানিকতলা কেস নামে খ্যাত।

১৫. টেগার্ট, স্যার চার্লস, পূর্বোক্ত, পৃঃ (১৩৯-১৪০)।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ঢাকার ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক মামলার তদন্ত কার্য পরিচালনা করতেছিলেন এবং দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের সপক্ষে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উদ্‌ঘাটন করেন। ফলে তিনি ব্রিটিশ বিরোধীদের রোষানলে পতিত হন। ১৯১৩ সালে সিলেটে গড়ডন নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক নিহত হন। ১৯১৪ সালে পুলিশ ইন্সপেক্টর নিপেন্দ্রনাথ ঘোষ কলকাতার শোভা বাজারে নিহত হন। এই হত্যাকান্ড চালান নির্মল কান্ত যিনি ঢাকার মানিকগঞ্জে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। এভাবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও পুলিশ অফিসার হত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে কলকাতায় তিনজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। একই বছরে রংপুরে একজন সুপারিনটেনডেন্ট হত্যার থেকে কোন রকমে রক্ষা পান। ১৯১৬ সালে কলকাতায় একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট নিহত হন।[১৬] ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস পুলিশের জন্য খুব খারাপ কাটে। বিশেষ করে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কয়েকদিন পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ২৯ আগস্ট বাংলার ইনটেলিজেন্স ব্রান্সের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ঢাকায় পুলিশ সুপার হডসনকে নিয়ে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অসুস্থ এক পুলিশ অফিসারকে দেখতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন। ফলে লোম্যান নিহত হন।[১৭]

এইসব ইংরেজ পুলিশ ও ভারতে বসবাসরত ইংরেজ জনগণের প্রতি ভারতবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কঠোর ছিল। তাই কেবল বিপ্লবী সদস্য নয় বরং অনেক সাধারণ ও একটু আবেগী জনগণও ইংরেজ বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলনে অংশ নেয়। এমন কি তারা ইংরেজদের হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এসবের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন বা ইংরেজ শাসনের অবসান। আর এ ধরনের চিন্তা ও চেতনাবোধ থেকে পুলিশের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়। কেননা পুলিশই তাদের এই জাতীয় আন্দোলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল।

পুলিশকে দমন বা হত্যা করার আরো অনেক কাহিনী জানা যায়। 'লাল বাংলা' নামে কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হয় বিপ্লবীদের দ্বারা। এই পুস্তিকায় পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বর্ণিত ছিল। সে মোতাবেক পুলিশ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যার জন্য পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।[১৮]

---

১৬. ঐ, পৃঃ (১৪০-১৪৪).

১৭. ঐ, পৃঃ (১২-১৩).

১৮. *Report on Administration of Bengal Presidency 1923—24*, PP (VIII—IX) এবং *ঢাকা প্রকাশ*, ২রা নভেম্বর, ১৯২৪ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৮৩ জন ভারতীয় গ্রেফতার হয়। এদের অধিকাংশ কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতার চেতনায় আচ্ছন্ন যে কোন আন্দোলনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে পুলিশকে কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এমন কি এ সময় গ্রেফতারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং সহিংস প্রচেষ্টাকে রোধ করার জন্য অপরাধ আইনেরও সংশোধন করা হয়। ফলে, এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কিন্তু ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এর ঘটনা বিপ্লবীদের সাময়িক সাফল্য এনে দিলেও শেষ পর্যন্ত তা টিকেনি। এই অগ্নিযুগে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণও ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে নেমে পড়ে। আর ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে তা প্রতিহত করতে ব্রিটিশ শাসক পুলিশকে ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে।

আসলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেছিল ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিতে তারা ছিল সন্ত্রাসবাদী। এই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়—

"Terrorism, as distinct from other revolutionary methods such as communism or the Ghadr movement, may be said to denote the commission of outrages of a comparatively 'individual' in nature. That is to say the terrorist holds the belief that Indian Independence can best be brought about by a series of revolutionary outrages calculated to instil fear into the British official classes and to drive them out of India. He commits other outrages for the purpose of arms, for the making of bombs and for the maintenance of his party, hoping that the masses will be drawn to his support either by fear or administration."[১৯]

১৯. J. M. Ewart, Director, Intelligence Bureau, *Terrorism in India, 1917-1936*, p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বাহিনী ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে বিপ্লবীদের প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চার্লস টেগার্ট এর বক্তব্য থেকে। টেগার্ট ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে দীর্ঘ ত্রিশ (৩০) বছর কাজ করেন। তার চাকুরি জীবনের শেষ আট বছর কলকাতা পুলিশের কমিশনার ছিলেন। তাঁর এক বক্তব্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি মন্তব্য করেন যে, গান্ধীজির অসহযোগ–অহিংসা আন্দোলন নয় বরং বিপ্লবীরাই পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের মনে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে।[২০] টেগার্টের এ ধরনের বক্তব্য থেকে পুলিশের মৌলিক উদ্দেশ্য এ সময়ের জন্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অসহযোগ ও অহিংসা আন্দোলন পুলিশের জন্য কোন বড় চ্যালেঞ্জ ছিল না বলে মনে হয়। তবে মূল টার্গেট ছিল বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যগণ।

কিন্তু বাস্তবে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে কঠোর হস্তে তাদের দমন করার জন্য। এই কঠোরতা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রশাসনের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় নিরীহ জনসাধারণকেও পুলিশী নির্যাতনের কবলে পড়তে হয়। এ ছাড়া সাধারণ জনগণের মাঝে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনগণ ও বাংলার মানুষ পুলিশ ও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। তাই, জনসাধারণ ও বিপ্লব পন্থীরা পুলিশের প্রতি সর্বদা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো। ফলে, অনেক পুলিশকে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

---

২০. টেগার্ট, স্যার চার্লস, পূর্বোক্ত, পৃঃ (VI—VII).

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের প্রতি সকল শ্রেণীর লোক যে কেবল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো তা নয়, কেননা পুলিশকে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে জনগণের আস্থাও অর্জন করতে হয়েছিল। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করেছিল। আর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে। ফলে, জনগণ যেমন উপকৃত হয়েছে পুলিশের নিষ্ঠাপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য, অনুরূপভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ পুলিশের কারণে জনগণকে দুর্ভোগও পোহাতে হয়েছে। পুলিশের কর্মকান্ড জনস্বার্থ বিরোধী হওয়ায় জনগণ পুলিশদেরকে সহজে গ্রহণ করতে পারতো না। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের প্রায় তিন দশক আগ থেকে নানা কারণে এদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ বাড়তে থাকে। এ সময়ে অনেক পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৩০ এর দশকে রাজশাহী অঞ্চলে একটি ডাকাতি মামলায় উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে সন্দেহজনক ডাকাতদের তালিকায় বহুসংখ্যক মুসলমান ধনী কৃষকদের নাম জড়িত করা হয় যারা কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ এর অনুসারী ছিলেন। এসব বিদ্বেষমূলক কাজকর্মও সাধারণ মানুষকে পুলিশের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।[২১]

পুলিশ যে জনগণের বন্ধু ছিল না, তা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের দাবী থেকে বুঝা যায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনগুলোতে সদস্যগণ প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনসহ নানা দাবী উত্থাপন করেন। পুলিশ একটি ব্যয়বহুল খাত হিসেবে এ বিভাগের ব্যয় কমানোর জন্য সদস্যদের মধ্য হতে সবসময় দাবী উত্থাপিত হয়েছে। সদস্যদের মতে বিদেশী শাসকগণ ভারতীয়দেরকে শাসন করার হাতিয়ার হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে জনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন।

২১. রাজশাহী জেলায় একটি থানায় কর্মরত একজন মুসলিম সাব-ইন্সপেক্টর এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি পুলিশের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিতে মুসলিমদের পক্ষ নেয়ায় অ-মুসলিম উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার বিরাগভাজন হওয়ার আশংকায় চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে পুলিশ জনগণের বন্ধু না হয়ে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত হয় এবং এর ফলে পুলিশের খরচও বৃদ্ধি পায় প্রচুর। তাই পুলিশ খাতে ব্যয় কমানোর জন্য আইন সভায় সদস্যরা একজোট হয়ে আইন সভায় সরকারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন।[২২] আইনসভার সদস্যদের দ্বারা পুলিশের ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার যাতে পুলিশকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যত্রতত্র ব্যবহার করতে না পারে। পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্ক যে বৈরিতাপূর্ণ ছিল তা ব্যবস্থাপক সদস্যদের উথাপিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

পুলিশের বেতন ছিল চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় নিম্নমানের। তাই পুলিশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই দুর্নীতি-পরায়ন হয়ে ওঠত ক্ষমতার অপব্যবহার এর মাধ্যমে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা ছিল সত্যই বড় কঠিন কাজ। আর পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত ক্রিয়া সম্পাদনাও করতো পুলিশ। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য অধিকাংশ সময়ই অগোচরে থেকে গেছে। পুলিশ কর্মচারি অনেক সময় নিজদেরকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি মনে না করে নিজেদেরকে প্রভু হিসেবেও বিবেচনা করত। ফলে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সবসময় সন্দেহ মুক্ত ছিল না। তাই পুলিশদেরকে জনগণ আপন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি।

২২. শওকত আরা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পুলিশ রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব সময়ই সংশ্লিষ্ট থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন বজায় রাখাসহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে পুলিশের মুখ্য কাজ। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সফলতা অর্জনে সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন বিধায় পুলিশের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, পুলিশ-ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পথ অনেকখানি সুগম করা সম্ভব।

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থা (১৯০০–১৯৪৭) এর পটভূমির আলোচনায় দেখা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট ৫-এর মাধ্যমে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার ভিত স্থাপিত হলেও ব্রিটেনে এর বহু পূর্বে ১৮২৯ সালে আধুনিক নগর পুলিশ প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবেই এদেশে আধুনিক পুলিশের ক্রমবিকাশ ঘটে। এর পূর্বে অবশ্য সুলতানী ও মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ ব্যবস্থা ছিল উমাইয়া ও আব্বাসীয় পুলিশের মত। যদিও মুঘল আমলে শেরশাহ এবং সম্রাট আকবর পুলিশ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালন করেন। তবে, পুলিশ ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নয়ন ঘটে লর্ড কর্নওয়ালিসের থানাদারি পুলিশ এবং রেগুলেশন XXII. ১৭৯৩-এর মাধ্যমে। পরবর্তীকালে রেগুলেশন ১৮০৮, X এবং বার্ডস কমিটি ১৮৩৮-এর মাধ্যমে পুলিশের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালের পুলিশ কমিশন গঠিত হয় এবং এ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পুলিশ এ্যাক্ট ৫, ১৮৬১ প্রণীত হয়। এই এ্যাক্টই পুলিশ ব্যবস্থার মৌল কাঠামো এবং দিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এতেও পুলিশের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তাই, পুলিশ সংস্কারের আরো পদক্ষেপ সূচিত হলেও ১৮৯০–৯১ বীম কমিটি ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে, পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কারের যুগান্তকারি পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯০২ সালের পুলিশ কমিশন গঠনের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০ সালের পরে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো ১৯০২-০৩ সালের কমিশন রিপোর্ট সুপারিশের আলোকে প্রণীত হয়। পুলিশের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও জনবল সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তিত হয়। কখনও বা কমিশন-সুপারিশের সাথে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রে। কমিশন-সুপারিশ অনুযায়ী গ্রাম্য পুলিশকে নিয়মিত পুলিশের বাইরে রাখার কথা বলা হয়। এই গ্রাম্য পুলিশই গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পুলিশ ফোর্সের নিয়মিত পুলিশ ও স্পেশাল পুলিশ সংগঠন এর মধ্যে নিয়মিত পুলিশই মৌলিক পুলিশ ফোর্স হিসেবে বিবেচিত ছিল। নিয়মিত পুলিশকে অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন শাখায় অবিভক্ত রাখা হলেও ১৯১২ সালের পরে পুলিশ কমিশন রিপোর্টের এ সুপারিশ অনুসৃত হয়নি। অনুরূপভাবে, পুলিশ সংগঠন থেকে মিলিটারি পুলিশ না রাখার কথা বলা হলেও পরবর্তীতে মিলিটারি পুলিশ সংগঠন বিদ্যমান ছিল এবং ১৯২১ এ এসে এর নাম পরিবর্তন করে Eastern Frontier Rifles রাখা হয়। কমিশন সুপারিশ মতে বেঙ্গল ও আসামে নৌ পুলিশ সৃষ্টি করা হয়। আর মিউনিসিপ্যাল পুলিশ ও অশ্বারোহী পুলিশকে অকার্যকরী করার কথা সুপারিশে বলা হলেও সীমিত আকারে অশ্বারোহী পুলিশ ছিল।

পুলিশ বাহিনীকে অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯০২ সালের কমিশন সুপারিশের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য এর পূর্বে পুলিশের জন্য নামেমাত্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ শুরু হলে নব-নিয়োগকৃত কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টরদের জন্য নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশের কিছু অংশের বাস্তবায়ন ঘটেনি। কনস্টেবলদের একচেটিয়া স্থানীয়ভাবে নিয়োগের কথা বলা হলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদতার জন্য পুলিশের চাকুরিতে প্রবেশের জন্যও ছিল অযোগ্য। তাছাড়া মুসলিম যুবকরা

Dhaka University Institutional Repository

স্বেচ্ছায় কৃষিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে বেশি মাত্রায় আগ্রহী ছিল। উপরোক্ত মুসলমানদের অনেকে আগ্রহী হলেও শারীরিক অযোগ্যতার জন্য নিয়োগ পেতে ব্যর্থ ছিল। সংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরা বেশি হলেও চাকুরিতে তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য। সাব-ইন্সপেক্টদের সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। প্রথমে পুলিশ প্রশিক্ষণের জন্য ভাগলপুর, রাঁচি ও পুরুলিয়ায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরে ঢাকায় ১৯০৬ সালে মিল ব্যারাকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হলেও ১৯১২ সালে তা রাজশাহীর সারদায় স্থানান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রকে ঘিরে দেশের পুলিশের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড আবর্তিত হয়। কনস্টেবলদের জন্য অবশ্য টাংগাইল, খুলনা, নোয়াখালি ও ঢাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কোর্সসমূহ আধুনিক করার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা হয় এবং নতুন নতুন কোর্স ও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯০২ সালের কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে মাত্র।

পুলিশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয় চেতনা সমৃদ্ধ আন্দোলন দমনেও মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও পুলিশের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বের মধ্যে ছিল সরকারি আইন বলবৎ রাখা, জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান, আইনের প্রতি হুমকিদানকারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, জনপদ সড়ক ও শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা, অপরাধের প্রতিকার ও তা সংঘটনের কারণ নির্ণয় করাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা সম্পাদনা করা। এসব পুলিশের প্রাথমিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯০০–১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুলিশকে মূলত রাজনৈতিক অপরাধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়াদি দমন করতে তৎপর

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে হয়েছে। আর এসব রাজনৈতিক সহিংসতা, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। তাই, ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী যে কোন আন্দোলনকে সরকার অবদমন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সেক্ষেত্রে পুলিশকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য পুলিশ সাধারণ অপরাধ দমনে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছিল। পুলিশের নানাবিধ জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিশেষ করে এই সময়ে পুলিশ ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক নির্ণয় করাও বেশ দুরূহ ছিল। কেননা পুলিশ খুন, ডাকাতি, দাঙ্গাসমূহ অন্যান্য অপরাধ দমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও কার্যত ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা অপব্যবহৃত হওয়ায় জনমনে পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক বিপ্লবী সদস্য, স্বাধীন ভারতে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ যারা বিভিন্ন সময় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ে ওঠেন। আর এ কাজের সাফল্য হিসেবে তারা ইংরেজ পুলিশকে টার্গেট করে। ফলে পুলিশ তাদের এসব কর্মকান্ড দমন করতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কঠোর ভূমিকা পালন করে। ফলে পুলিশ সম্পর্কে একটা অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে সিভিল সোসাইটির মধ্যে।

পরিশেষে, পুলিশ ব্যবস্থার সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মূলতঃ পুলিশ কমিশন ১৯০২-০৩ রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে পুলিশের সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা পরিচালিত হয়। এ সময়েই কমিশনের সুপারিশের বৃহদাংশ বাস্তবায়িত হয়। ১৯৪৭-এর পর স্বাধীন দেশের চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসন ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা হলেও এর সাংগঠনিক ভিত্তি স্বাধীনতা পূর্ব যুগের মত রয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -ক

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS OF THE POLICE COMMISSION 1902-03.

200. The Commission think that it will be convenient if they conclude their report with a summary of their recommendations. The most important of these are as follows :-

I-ORGANIZATION

(a) District Police.

(1) That the police force should consist of (a) a European Service, to be recruited entirely in English: (b) a Provincial Service, to be recruited entirely in India; (c) an Upper Subordinate Service, consisting of Inspectors and Sub-Inspectors ; and (d) a Lower Subordinate Service, consisting of head constables and constables. *Paras, 64, 66, 58, 61, 57 & 54.*

(2) That the office of Inspector-General should ordinarily by held by a selected District Magistrate, and that the Inspector-General in Bombay should be given the same powers as are exercised by Inspectors -General in other provinces. *Paras, 71 & 118.*

(3) That all the large provinces should be divided into ranges and that a Deputy Inspector-General should be placed in full should be placed in charge of the police of a district. *Para, 70.*

(4) That no officer of lower grade than that of Superintendent should be placed in charge of the police of a district. *Para, 191.*

(5) That a certain number of Superintendentships should be reserved for members of the Provincial Service. *Para, 67.*

(6) That for some of the large districts in Madras and for Khandesh in Bombay two Superintendents are required. *Para, 191.*

(7) That on the analogy of the Provincial Civil Service a grade of Deputy Superintendents should be created; the status of these officers being the same as that of Assistant Superintendents. *Para, 66.*

(8) That there should be one Assistant or Deputy Superintendent in every district and that in the large districts one or more additional officers of this class should be appointed to hold charge of a submission. *Para, 191.*

(9) That each district should be divided into circles consisting, a rule, of from 5 to 8 police stations, except in the case of large towns , when the town and its environs should form one circle. *Para, 193.*

(10) That an Inspector should be placed in charge of each circle to supervise all police work within it. *Para, 61.*

(11) That the ordinary area of a police station should be about 150 square miles.

Dhaka University Institutional Repository

(12) That the officer in charge of a police station should be of the rank of Sub-Inspector, and that where the work of investigation in heavy, one or more additional officers of this rank should be appointed in order to obviate the necessity of employing any officer of lower rank in investigation offences. *Para. 58.*

(13) That one head constable should be attached to every police station to perform the duties of station writer. *Para. 195.*

(14) That the establishment of a police station should also contain a second head constable to render general assistance to the Sub-Inspector, but not to undertake the investigation of any offence independently of that oficer. *Para. 195.*

(15) That the duties of constables should be of a mechanical character, such as esoorts, guards, patrols and the like, and that they should be employed on the more responsible duties of the police only under the direct orders of some superior officer. *Para. 54.*

(16) That there should be for each district, or in some cases for each group of districts, a force of armed police sufficient to deal with tumults and local disturbances, a fixed portion of this force being kept in reserve always ready to proceed to any place where it may be needed. *Para. 74.*

(17) That this Headquarters Force should be in charge of an European Inspector assisted where necessary by a European sergeant. *Para. 74.*

(18) That the division of the police into armed and unarmed branches is undesirable. *Para. 75.*

(19) That the military police in Bengal should be abolished. *Para. 73.*

(20) That mounted police are very expensive and should not be employed unless necessity for them is clearly established. *Para. 78.*

(21) That European sergeants are required for cantonments, seaports, large railway stations and other places where the police may have to deal with Europeans. They are also needed in some cases to stiffen the armed Headquarters Forces. They are unsuitable for employment in the interior. *Para. 80.*

(b) Railway Police.

(22) That, with few exceptions, the limits of the jurisdiction of the railway police forces should be conterminous with the limits of the provinces. *Para. 106.*

(23) That the organization of the railway police should follow the lines recommended for the district police. *Para. 110.*

Dhaka University Institutional Repository

(24) That the duty of the railway police should be confined to the maintenance of law and order, and that they should not undertake the duty of watch and ward. *Para. 208.*

(25) That a constable or head constable should travel in every passenger train. *Para. 110.*

(26) That the railway police should not be required to investigate cases of shortage or missing goods, unless they have reason to suspect the commission of a cognizable offence; or to examine the seals or goods wagons. *Para. 112.*

(c) River Police.

(27) That for the prevention and detection of serious crime on the navigable rivers in Bengal and Assam a separate river police force under a Superintendent is necessary. *Para. 113.*

(d) Municipal and Cantonment Police.

(28) That no separate police forces should be maintained for municipalities and cantonments and that where payment for such police is now made from municipal or cantonment funds the charge should be transferred to provincial revenues, which should be relieved of equal expenditure on some other branch of the municipal or cantonment administration; but these recommendations do not apply to the presidency towns, which may require separate treatment. *Para. 114.*

(e) Police of the Presidency Towns and Rangoon.

(29) That the complete separation which now exists between the city and district police does not conduce to systematic co-operation between the two forces and leaves the Inspector-General in ignorance of the police work in the most important charge in the province. *Para. 95.*

(30) That if the Commissioner of Police is placed under the Inspector-General, the former must retain much larger powers of discipline and control than are accorded to District Superintendents. *Para. 95.*

(31) That the Commissioner of Police should be graded as a Deputy Inspector-General. *Para. 95.*

(32) That the office of Deputy Commissioner as now constituted should be abolished. *Para. 96.*

(33) That the present class of Superintendents should be abolished, their place being taken by a small number of officers of the rank of District Superintendent, who should be deputed for duty in the city. *Para. 96.*

(34) That in respect of the lower ranks, the organization should be similar to that of the district police, but that a larger proportion of Europeans is necessay. *Para. 97.*

Dhaka University Institutional Repository

(f) Criminal Investigation Departments.

(35) That there should be constituted in each province a Criminal Investigation Department for the pupose of collating and distributing information regarding organized crime, and to assist in the investigation of crimes when they are of such a special character as to render this assistance necessary. *Para. 166.*

(36) That in all the larger provinces the head of this department should be an officer of the rank of Deputy Inspector-General, who should also have the administrative charge of the railway police of the province. *Para. 166 & 190.*

(37) That he should have a Personal Assistant of the rank of District Superintendent. *Para. 191.*

(38) That the work now done by the Secretariat Police officer should be transferred to the Criminal Investigation Department, which would also include the Provincial Finger Print Bureau. *Para. 166.*

(39) That there should be a similary department for the whole of India, presided over by an officer of the standing and experience of an Inspector-General. *Para. 167.*

(40) That the functions of this Central Department should be to collect, collate and communicate information obtained from the Provincial Criminal Investigation Departments or otherwise. *Para. 168.*

(41) That its intervention in the investigation of officences should ordinarily be confined to such special technical crimes as note forgeries, but that it should also assist local authorities by obtaining for them the services of officers acquainted with the personnel or methods of criminals who come from outside the province. *Para. 168.*

(42) That the central agency should be brought into connection with the police of the Native States for the purpose of obtaining full information regarding the commission of organised crime therein. *Para. 173.*

II. —RECRUITMENT AND TRAINING.

(43) That the recruitment of the European service should be by competitive examination in England, on the same conditions as at present, except that the age limits for candidates should be 18 to 20. *Para. 64.*

(44) That successful candidates should be required to undergo a two years' course of training at an English residential university where there is a Board of Indian Studies, each candidate receiving an allowance during this period of £100 a year; and that the course of study should included criminal law and practice, taking of notes of cases in the criminal courts, an Indian vernacular, Indian history, geography and ethnology and riding. Probationers should also be required to join a volunteer corps and become efficient. *Para. 64.*

Dhaka University Institutional Repository

(45) That in addition to this probationary training in England each Assistant Superintendent should on arrival in India be attached for one session to the provincial training school. *Para. 64.*

(46) That the provincial service should be recruited in respect of one-half of the vacancies by the promotion of carefully selected Inspectors; and in respect of the other half by the selection of natives of India who have qualified for the provincial service in the Revenue, Judicial or Police Departments, or by the appointment of any Native officer already employed in such provincial service. *Para. 66.*

(47) That any selected candidate who has had no police experience should undergo a course of training at the provincial training school. *Para. 66.*

(48) That the recruitment of Inspectors should ordinarily be by the promotion of selected Sub-Inspectors, but that in respect of not more than 20 per cent of the vacancies the Government should reserve to itself the power to make direct appointments, men so appointed being sent to the provincial training school for a course of instruction. *Para. 61.*

(49) That, save in exceptional cases, the promotion of Sub-Inspectors should by by direct appointment, and that promotions of head constables to this rank should be strictly limited and should in no case exceed 15 per cent. of the vacancies. *Para. 58.*

(50) That probationers should be selected from a general list of candidates, compiled by the Inspector-General of Police from lists prepared by Commissioners of Divisions with the assistance of District Magistrates and Superintendents of Police. *Para. 58.*

(51) That no person should be eligible for entry in these lists unless he is of good moral character and social position, possesses the necessary educational qualification, which shall in no case be lower than the University Matriculation or School Final Examination, is between the ages of 21 and 25 years, and is physically fit for police service. *Para. 58.*

(52) That a provincial training school should be established in each of the larger provinces for the training of police officers of and above the rank of Sub-Inspector. *Para. 59.*

(53) That the Principal of this school should ordinarily be a carefully selected Superintendent of Police, assisted by a competent and adequate staff of instructors. *Para. 59.*

Dhaka University Institutional Repository

(54) That the course of instruction should include Criminal Law and the Law of Evidence, Police Procedure anents should be made for giving practical training in station-house work; and that special instruction should be given in regard to the manner in which police officers should conduct themselves towards the public. *Para. 59.*

(55) That the recruitment of head constables should be by promotion from the ranks, except where it is impossible to find among the constables a man qualified for the post of station writer. *Para. 57.*

(56) That constables should be recruited locally so far as is possible; that recruitment should be confined to the classes which are usually regarded as respectable, care being taken to ascertain that the candidates are of good character and antecedents. Members of the criminal classes should not be enlisted. *Para. 54.*

(57) That a due proportion should be maintained between the importance attached respectively to physical and educational standards, with a view to increasing the number of literate men in the force. *Para. 54.*

(58) That for the training of constables central schools should be established for groups of districts; that each school should be under a Deputy or Assistant. Superintendent, assisted by a staff of Inspectors and Sub-Inspectors; that the course of training should extend over six months and should include instruction in drill, discipline, elementary law and police procedure and the manner in which police officers should conduct themselves towards the public. *Para. 55 193 & 194.*

III. —PAY.

(59) That the minimum pay of constables should be fixed for each province or part of a province at a rate which will give a reasonable living wage for a man of the class required; that in no province should this minimum pay be less than Rs. 8 a month, while in Burma it should be about Rs. 12. *Para. 56.*

(60) That after three years of approved service the pay should be raised by one rupee per mensem, after a further period of five years by another rupee, and after seven years more by a third rupee; in Burma the increment should be Rs. 2 instead of one rupee. *Para. 56.*

(61) That good conduct allowances should be abolished, and that specially good service should be rewarded by entries in the character book or long roll, by good service stripes, or by money rewards. *Para. 56.*

(62) That head constables should be divided into three grades carrying pay at Rs. 15, Rs. 20 and Rs. 25 a month, respectively. *Para. 57.*

Dhaka University Institutional Repository

(63) That Sub-Inspectors should be divided into four grades on salaries of Rs. 50, Rs. 60, Rs. 70 and Rs. 80; that they should also receive a horse allowance of Rs. 15 a month, but no special allowance for the charge of a police stations; that while at the school they should receive Rs. 25 a month and no horse allowance; and that they should be given a reasonable advance for the purchase of a horse, uniform and accoutrements. *Para. 60.*

(64) That Inspectors should be divided into four grades on Rs. 150, Rs. 175, Rs. 200 and Rs. 250. *Para. 62.*

(65) That Inspectors in charge of rural circles should receive travelling allowance at the rate of one rupee per diem, and that all other Inspectors should be given a horse or conveyance allowance of Rs. 15 per mensem. *Para. 62.*

(66) That Deputy Superintendents should be divided into four rades, carrying salaries of Rs. 250, Rs. 300, Rs. 400 and Rs. 500 a month. *Para. 68.*

(67) That Assistant Superintendents should be divided into three grades on Rs. 300, Rs. 400 and Rs. 500 a month, respectively. *Para. 65.*

(68) That Superintendents in the Provincial Service should be graded on salaries of Rs. 600, Rs. 700, Rs. 800 and Rs. 900 a month. *Para. 68.*

(69) That Superintendents of the European Service should be divided into five grades with salaries of Rs. 700, Rs. 800, Rs. 900, Rs. 1,000 and Rs. 1,200 a month; but that no Superintendent should receive promotion to the Rs. 900 grade if he is considered unfit to hold charge of the police of any of the more important districts. *Para. 65.*

(70) That Deputy Inspector-Generals should be divided into three grades on Rs. 1,500, Rs. 1,750 and Rs. 2,000 a month, respectively, and that these officers should be eligible for the special pension of an additional Rs. 1,000 a year provided for in the Civil Service Regulations. *Para. 70.*

(71) That the pay of the Inspector-General in the larger provinces should be fixed at Rs. 2,500—100—3,000, so as to secure his retention in the office for a considerable period; that in Assam and the Central Provinces the Inspector-General should receive a local allowance of Rs. 250 a month in addition to his salary as a member of the Commission; and that the Inspector-General of the North-West Frontier Province should be given the pay of a Deputy Inspector-General of the first class, namely, Rs. 2,000 a month. *Para. 71.*

(72) That free-quarters should be provided for every police officer of or below the rank of Sub-Inspector; the quarters now provided are in many cases unsuitable, and in some instances are unfit for human habitation. *Para. 88 & 104.*

Dhaka University Institutional Repository

(73) That all officers should be entitled to retire on full pension after 25 years service, and that the Government should be empowered to dispense with the services of any officer after that period of service. *Para. 87.*

IV.—STRENGTH

(74) That the police forces are at present inadequate in every province and must be increased. *Para. 198.*

(75) That a reserve is required to supply men for the vacancies caused by casualties; that in the case of the European superior staff this should be provided in the rank of Assistant Superintendent, while for the provincial and upper subordinate service it should be provided in the rank of Sub-Inspector and should be fixed at 14 per cent of the total strength of those services; that for European Inspectors and Sergeants it should be provided in the lower rank at 10 per cent of the total strength; and that for constables and head constables it should be provided by an addition to the rank of constable of 15 per cent of the total strength of both constables and head constables. *Para. 79.*

V. —DISCIPLINE

(76) That the District Magistrate should not interfere in matters of discipline, which should be left entirely to the officers of the force, but the Magistrate should have power to direct the Superintendent to make an enquiry into the conduct of subordinate officers, and if he is not satisfied with the result of that inquiry he should be at liberty to bring the matter to the notice of the Deputy-Inspector General or Inspector-General. *Para. 81, 121 & 122.*

(77) That no officer of rank below that of Superintendent should be empowered to inflict any punishment except extra drill and confinement to quarters. *Para. 82.*

(78) That evidence of general repute should be admissible to prove a charge of corruption. *Para. 84.*

(79) That removal from service upon reduced pensions or gratuities should be permissible in the case of officers who are proved to be inefficient. *Para. 85.*

VI. —VILLAGE POLICE

(80) That it is of paramount importance to develop and foster the existing village agencies available for police work. *Para. 31 & 50.*

(81) That the responsibility of the village headman for the performance of the village police duties should be recognised and enforced in every province; and that the village watchman must be a village servant subordinate to the village headman and not to the regular police. *Para. 48.*

Dhaka University Institutional Repository

(82) That the supervision and control of village headmen should be entrusted to the Collector or Deputy Commissioner and his subordinate officers. *Para. 47.*

(83) That the regular periodical attendance of village watchmen at the police station is unnecessary and undesirable. *Para. 49.*

(84) That it is expedient to relegate the trial of petty offences to village headmen or punohayats, and that where this system does not exist it should be cautiously and experimentally introduced. *Para. 51.*

VII. —RELATIONS BETWEEN THE MAGISTRATES AND THE POLICE

(85) That Divisional Commissioners should not interfere directly in the details of police administration, but that their responsibility should be limited to the duty of supervising and advising District Magistrates. *Para. 120.*

(86) That the responsibility of the District Magistrate for the criminal administration of the district must be preserved, and that he must, therefore, be given authority over the police; but that this authority should be of the nature of general control and direction and not a constant and detailed intervention. *Para. 123.*

(87) That whenever a District Magistrate has been compelled to take an active part in the investigation of any case, he should not try the case himself. *Para. 123.*

(88) That if a District Magistrate receives a report from the police that in any case there has been or is likely to be a failure of justice and he sees reason to interfere, he should proceed in open court in accordance with the provisions of the law. *Para. 123.*

(89) That as regards other Magistrates it is desirable to impress on their attention that the law provides that their connection with a case shall begin from the receipt of the police report containing the first information regarding it and continue to the end. *Para. 124.*

(90) That it is the duty of the Magistrate to examine the reports which from time to time he receives under the provisions of the Criminal Procedure Code and that he must make every effort to discover the truth. *Para. 124.*

(91) That strictures on a police officer should be recorded in a separate note, unless his misconduct is established after his explanation has been heard, or unless reference to it in the judgement is necessary for the elucidation of the case. *Para. 126.*

VIII. —PREVENTION

(92) That proof of previous convictions which would render section 75 of the Indian Penal Code applicable should be permitted at any time before the release of the offender, and that the law should be amended to secure this. *Para. 132.*

Dhaka University Institutional Repository

(93) That the Code of Criminal Procedure should be amended so as to allow of any first class Magistrate being invested with powers under section 30 in respect of the trial of old offenders. *Para. 133.*

(94) That enquiries into cases of bad livelihood should invariable be held in the village of the person against whom information has been received. *Para. 135.*

(95) That section 565 of the Code of Criminal Procedure should be amended, so as to forbid a person under police supervision to absent himself from his home without first reporting his intention to do so; and that the maximum penalty for breach of the rules under that section should be raised to imprisonment of either description for one year. *Para. 136.*

(96) That a provision should be inserted in the Criminal Tribes Act authorising the simple registration of notified criminal gangs and the taking of the finger impressions of the adult male members; that full information be collected about all criminal tribes and gangs as a preliminary to dealing with themmore effectually than at present; and that it is essential to the success of any such measures that they should be extended to Native States. *Para. 137.*

(97) That police surveillance over criminals should be confined to those who are really dangerous, and that a uniform system of history sheets, surveillance registers and reports of movements of habitual criminals should be established for the whole of India. *Para.139.*

(98) That the present system of beats lowers the position and weakens the authority of the village headmen and should be abolished;' and that the visits of police constables to villages should be only for the purpose of obtaining specific information. *Para. 53.*

(99) That the lighting of streets in municipal towns everywhere calls for improvement. *Para. 144.*

(100) That for the purpose of suppressing cattle theft, the offence defined in section 215 of the Indian Penal Code should be made congnizable; and that the voluntary registration of sales of cattle and the grant of passes or certificates of ownership by the village headman should be encouraged. *Para. 146.*

IX. —INVESTIGATION OF OFFENCES

(101) That the investigation of offiences should be made "on the spot"; that is, at the place most suitable for its success and for the convenience of the people. *Para. 151.*

Dhaka University Institutional Repository

(102) That the discretion given by clause *(b)* of the proviso to section 157 of the Code of Criminal Procedure should be exercised subject to the following general principles :— (I) No investigation should be made in anything which the complainant may have to say, seems to fall under section 95 of the Indian Penal Code. (2) No investigation should be made in any case where the complaint shews that the complainant is apparently seeking to take advantage of a petty or technical offence to bring into the Criminal Courts a matter which ought properly to be decided by the Civil Courts. (3) No investigation should be made into any case which the village Magistrate or headman or other village tribunal is empowered under any local law to deal with and dispose of. (4) In cases other than those of the three clauses specified above the police otticer should ordinarily make investigation if the complainant so desires, but he should not enter on an investigation if the injured person does not wish for one, unless the offence appears to be of a serious character, or the offender is an habitual criminal. *Para. 152.*

(103) That the offences punishable under sections 341, 342, 374, 406 and 447 should be made non-cognizable. *Para. 153.*

(104) That the power to arrest without warrant persons who within the view of the police officer commit what may be generically termed "nuisance cases," which is given by section 34 of the Police Act (Act V of 1861) and by the Municipal Acts of most provinces, should be withdrawn, the police being left to deal with such offenders under the provisions of section 57 of the Code of Criminal Procedure. *Para. 154.*

(105) That it should be clearly laid down, by the enactment, if necessary, of a proviso to section 157 of the Criminal Procedure Code, that the police officer receiving information of a cognizable offence is not compelled to make an immediate arrest of the offender; that in cases in which there is no reason to believe that the accused will abscond it may sometimes be wise to apply in the first instance to the Magistrate, who may issue either a warrant or summons as he sees fit. *Para. 155.*

(106) That the discretion given by the law regarding the taking bail in non-bailable cases is not sufficiently or generally realized. The existence of reasonable suspicion against any person justifies his arrest (section 54 of the Code of Criminal Procedure), but that there must be "reasonable ground for believing that the accused has been guilty of the offence' to justify refusal of bail (section 497). *Para. 156.*

(107) That the power of taking bail given to an officer in charge of a police station by sections 169, 496 and 497 of the Code of Criminal Procedure should also be given to an officer making an investigation. *Para. 156.*

(108) That the power to depute a subordinate to make an arrest which is given by section 56 of the Code of Criminal Procedure to the officer in charge of a police station should also be given to any officer conducting an investigation. *Para. 158.*

Dhaka University Institutional Repository

(109) That the use of handcuffs and other forms of restraint and restrictions as to food, clothing and visits of relatives and legal advisers, in the case of a person under arrest, but not proved guilty, should be limited to what is reasonably necessary to prevent escape or the evasion of justice. *Para. 161.*

(110) That the detention of suspects without formal arrest is illegal and must be rigorously suppressed. *Para. 162.*

(111) That the law should be amended so as to render it possible to enforce the obligation to answer questions imposed by sub-section 2 of section 161 of the Code of Criminal Procedure. *Para. 164.*

(112) That in all important cases the Magistrate should peruse the diary prepared under section 172 of the Code of Criminal Procedure; statements recorded under section 162 (I) should not be entered in this diary, which should contain only the purport of the information given by each witness. *Para. 160.*

(113) That the practice of working for or relying on confessions should be discouraged in every possible way; and that confession should be recorded only by a Magistrate having jurisdiction to inquire into or try the case. *Para. 163.*

X. —PROSECUTION

(114) That in every Sessions Division, and in every district where the Sessions Division includes more than one district, a qualified member of the local Bar should be appointed a Public Prosecutor for the conduct of important cases; and that such appointment sould be for a term of years. *Para. 178.*

(115) That for every district a Police Inspector should be appointed a Public Prosecutor for the conduct of cases in the magisterial courts, that he should be assisted where necessary by one or more Sub-Inspectors; and that at the headquarters of each magisterial subdivision a Sub-Inspector should be appointed as Public Prosecutor for the courts in that subdivision. *Para. 178.*

(116) That these Prosecuting Inspectors and Sub-Inspectors should not be required to perform ministerial duties in connection with the courts, or clerical work in connection with ordinary police. *Para. 178.*

(117) That section 337 of the Code of Criminal Procedure should be amended so as to allow the tender of pardon in all cases triable by the Court of Session, instead of as at present, only in those exclusively triable by such a Court. *Para. 180.*

(118) That the postponement and adjournment of cases causes grievous hardship to parties and witnesses and serious injury to police work. *Para. 181.*

(119) That the scriptory work of police officers should be reduced as much as possible, and that the statistical returns should be limited as recommended in the appendices. *Para. 184.*

Dhaka University Institutional Repository

(120) That police work should not be judged by statistics, but by local inspection and inquiry. *Para. 182.*

(121) That Superintendents should, as far as possible, be relieved of work in connection with accounts. *Para. 186.*

(122) That miscellaneous work not connected with proper police duties should not be imposed on police officers. *Para. 53.*

XI. —MISCELLANEOUS

(123) That there should be a single Police Act for the whole of India. *Para. 91.*

(124) That the police manuals of every province require to be largely reduced in bulk, and that that portion of each manual which is of general application should be prepared under the instructions of the Government of India. *Para. 187.*

(125) That there should be greater uniformity of nomenclature as regards both the personnel of the Police Department and its records. *Para. 90.*

(126) That there should be periodical conferences between the Inspectors-General of the different provinces. *Para. 174.*

(127) That the Government of India should supplement their occasional reviews of the annual Police Reports by a quinquennial review of police work for the whole of India. *Para. 174.*

201 These are the recommendations which the Commission submit for the consideration of the Government of India.

Conclusion.

They have endeavoured, in the course of an inquiry conducted in every province of India, to ascertain the state of the police force and the feeling of the country in regard to it. They have received the evidence not only of witnesses who have been recommended to them either as possessing some considerable knowledge of the subject or as representing some particular class of the community or some phase of public opinion, but also of witnesses who have come forward in response to a general invitation of the fullest and freest character. They belive that, in that evidence, public opinion has been as completely set forth, and the views of all classes as to the need of reform and the principles on which reform should be effected have been as fully represented, as possible. They have carefully discussed with representative witnesses of all classes both the causes which have conduced to the prevailing defects in the police administration and to the present attitude of the people towards the police and also the various remedial measures which have occurred or been suggested to them. They have carefully considered all the evidence before them at special meetings held for that purpose at the close of their tour in each province, and at a series of meetings held at Simla on the conclusion of their inquiry. The result of their labours and deliberations is now submitted in this report. They are unanimous in their views and in their proposals, except that the Maharaja of Darbhanga differs from them on two points to which reference has

Dhaka University Institutional Repository

already been made. There can be no doubt whatever that the evidence laid before the Commission has fully established the necessity for the inquiry which has been instituted. The police force is far from efficient; it is defective in training and organisation; it is inadequately supervised; it is generally regarded as corrupt and oppressive; and it has utterly failed to secure the confidence and cordial co-operation of the people. The proposals for reform submitted by the Commission are not, however, of a revolutionary character. They do not involve a complete subversion of the present system, though they aim at its radical amendment. They consist mainly in suggestions for the maintenance and development of indigenous local institutions so as to obviate the vexatious interference of the police in cases of little importance and to promote the co-operation of the people with the police in those of a more serious character; for the restriction of the lowest classes of officers to the discharge, under closer supervision, of those more mechanical duties for which alone they are qualified; for the conduct of investigation by trained officers drawn from the better educated and more respectable classes of the community; for inspection of police work by carefully selected and trained officers of capacity and tried integrity; for supervision and control by the best European and Native officers available; and for organised and systematic action against organised and professional crime. They aim also at the removal of abuses which have been brought to light in connection with police work; at the employment of native agency to the utmost extent possible in each province without seriously impairing the efficiency of the service; at the attraction to the service of good Native officers by offering them suitable position and prospects; at the recruiting of superior European officers of a higher class and insisting on their coming more into touch with the people; and at the adoption on the part of the whole force of a more considerate attitude towards all classes of the community so as to secure as far as possible the confidence and co-operation of the people. The Commission are not sanguine enough to believe that their proposals, even if fully adopted, will result in the immediate removal of all cause of complaint. These reforms can in any case be only gradually introduced; and years must pass before their full effects are realised. Inferior men have to be got rid of in all ranks; and evil traditions have to be broken in the force. The attitude of the people towards the police, and public opinion in regard to unrighteousness and corruption, have to be raised. All this must be, before the objects aimed at can be satisfactorily achieved. Of this the Commission are fully aware; and the members can hardly expect themselves to see the full introduction of all the reforms they propose, still less to see their full results in improved police administration. But even a generation of official life is a short period in the life of a people; and the Commission believe that, before that period expires, very substantial advantages will have resulted from reforms carried out somewhat on the principles they recommend. What is required is the definite adoption of a policy based on such principles, and determined persistence in giving it effect. The Commission are confident that the recommendations they make, if accepted and persistently enforced, will result in inestimable advantage. They are encouraged in their confidence by the result of the application of similar

Dhaka University Institutional Repository

principles in England. The Report of the English Police Commission presented to Parliament in 1839, contains a melancholy picture of the state of the English police and of the attitude of the people towards them. The principal remedies proposed in that report are very similar in aim to some of those now submitted to the Government of India; and the comparison of the state of the English police and their relations with the people now with those of sixty years ago give great ground for hope. The Commission are encouraged also by their own experience, as well as the evidence they have received, of the great improvement in the Indian Judicial and Revenue Departments, where principles such as some of those which they advocate have been applied. The character of the officers has been raised; the whole town of the services has been improved; the confidence of the people is being more and more secured; and public opinion itself is higher in respect of the matters with which these officers deal. The Commission, therefore, make their recommendations ina hopeful spirit. They realise that they involve large expenditure; but they feel that the police department, which so nearly concerns the life of the people, has hitherto been starved; that the reforms they propose are absolutely essential; and it is well worth while to pay for them the price required.

A. H. L. FRASER, President.
E. T. CANDY,
RAMESHWARA SINGH*
(Maharaja of Darbhanga) Members.
S. SRINIVASA RAGHAVAIYANGAR,
J. A. L. MONTGOMERY,
W. M. COLVIN,
A. C. HANKIN)

H. A. STUART, Secretary.
Simla,
The 30th May 1903.

* Signed subject to Note of Dissent appended.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট—খ

বৃটিশ আমলে সারদা পুলিশ একাডেমিতে রাইফেল প্রশিক্ষণের কয়েকটি চিত্র

চিত্র-১

'SLOPE' SWORD

চিত্র-২

THE "SALUTE"

চিত্র-৩

"THE RECOVER"

চিত্র-৪

KNEELING — LOAD

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫

READY

চিত্র-৬

REST

চিত্র-৭

STANDING —AIMING

চিত্র-৮

STANDING—LOAD

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট—গ

পুলিশ একাডেমি সারদা

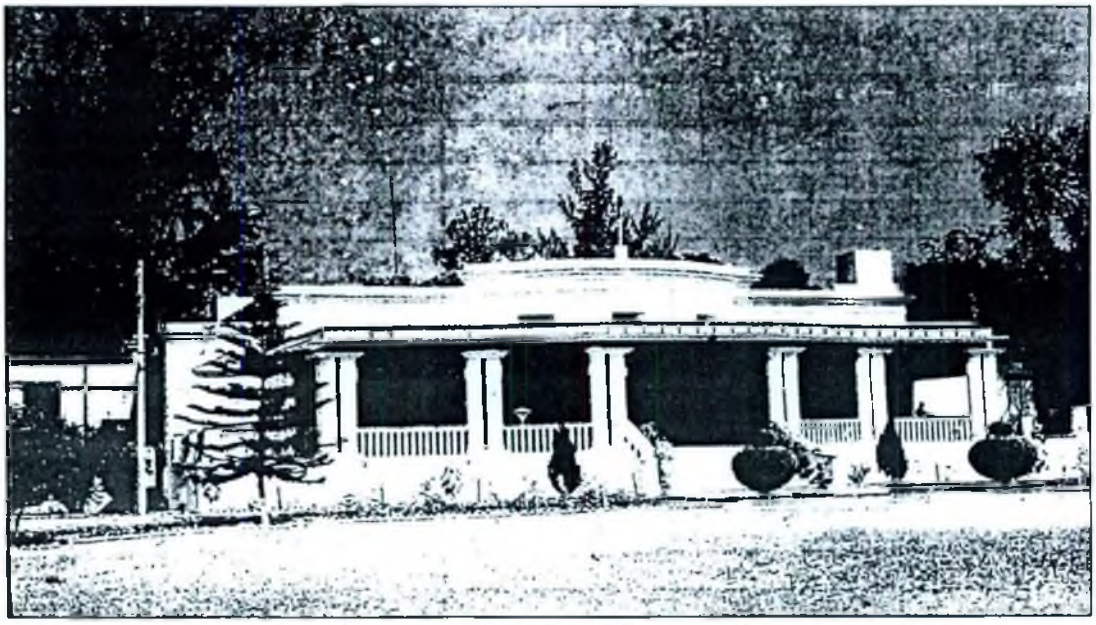

সারদা পুলিশ একাডেমী অফিসার্স মেস, প্রাচীন বড় কুঠি

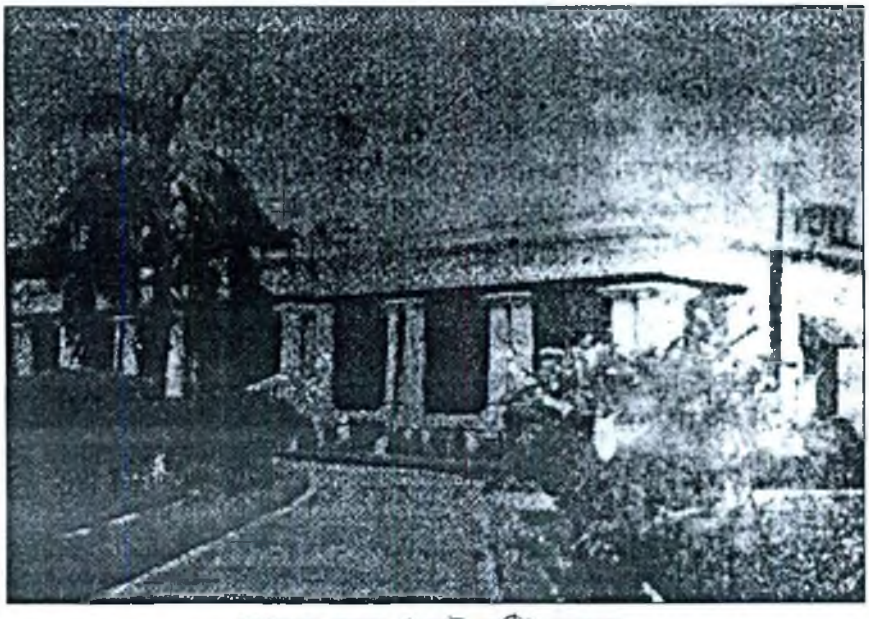

অধ্যক্ষ ভবন (ছোট কুঠি) সারদা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট—ঘ

সারদা পুলিশ একাডেমির প্রাক্তন অধ্যক্ষগণ (১৯১২-১৯৪৭)

মেজর এইচ টীনলি
১৯১২-১৯১৯

মিঃ জ মেকেঞ্জী আই, পি
১৯১৯-১৯২১

মিঃ এ, ডি, গর্ডন আই, পি,
১৯২১-১৯২৪

মিঃ জি, এইচ, ম্যানুচ
১৯২৪-১৯২৮

মিঃ জি, সি, ষ্টার্লিস আই, পি,
১৯২৮-১৯৩২

মিঃ সি, ওয়েলী
১৯৩২-১৯৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মিঃ ভব্লিউ, জি থ্রোপ আই, পি
১৯৩৪-১৯৩৫

মিঃ এস, জি, টেইলর আই, পি,
১৯৩৫-১৯৩৯

মিঃ ই, এইচ, লি-ব্রোকো আই, পি,
১৯৩৯-১৯৪৩

মিঃ এম, এ, খান পি, এস, পি.
১৯৪৩-১৯৪৭

মিঃ ওয়াহ এ সায়ীদ পি, এস, পি
১৯৪৭-১৯৫১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

(I) UNPUBLISHED SOURCES

Government of Bengal, B—Proceedings, Police Branch, 1900—1947.

Political Department, Police Branch, June, 1909.

Home Department, Police Branch, May, 1912—1914.

(II) PUBLISHED SOURCES

Official Publications : Reports

Government of Bengal, *Report of the Superintendent of Police.* Lower Provinces, Judicial Department, Calcutta : Bengal Military orphan press, 1939.

Government of Bengal, *Final Report of the Police Commission of 1860 and the Resolution of the Government of India,* Home Department, 1862

Government of Bengal, *Report on the Police of the Lower Provinces of the Bengal Presidency, 1870.* Home Department, Calcutta, Calcutta Central Press Company Limited, 1871.

Government of Bengal, *Beam Committee of Bengal, 1891.* Home Department, 1893.

Government of India, *Report of the India Police Commission 1902-03* , Simla, Printed at the Government Central Printing Office, 1903.

Government of Bengal, *Reprt of the Railway Police Committee 1908,* Political Department, Police Branch, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1909.

Government of Bengal, *Report of an enquiry into the cost and organization of the Calcutta Police 1935,* Home Department, Police Branch, Alipore, Bengal Government Press, 1935.

Government of Bengal, *Report on the Administration of the Police of the Lower Provinces, Bengal Presidency, 1902,* Political Department, Calcutta, the Bengal Secretariat book depot, 1903—1911.

Dhaka University Institutional Repository

Government of Bengal, *Report on the Police Administration in the Bengal Presidency 1912*, Home Department, Calcutta, the Bengal Secretariat book depot, 1913—1940.

Government of Bengal, *Report on the Administration of Bengal, 1900—1901*, Revenue Department, Calcutta, Printed at Bengal Secretariat Press, 1902—1947.

Government of Bengal, *Report on the Unarmed Branch of the Police Force, 1937*, Political Department, Police Branch, Alipore, Bengal Government Press, 1937.

Government of Pakistan, *Report of the Pakistan Police Commission 1960—1961*, Ministry of Home Affairs, Lahore, 1961.

Government of Bangladesh, *Report of the Committee on Police Training 1977*, Ministry of Home Affairs, Dhaka. 1977.

Government of Bengal, *A statement of the Strength of the Police Force in Bengal and of certain pending schemes, 1921*, Political Department, Calcutta, 1921.

III. ইংরেজি গ্রন্থ

Black, A, *The people and the police*, Newyork, 1980.

Bunyard, R. S., *Police : Organization and Command, London, 1978.*

Bayley, David, H., *Police and Politicat Development in India, Princeton, 1969.*

Cox, Edmund. C, *Police and Crime in India, London. 1919.*

Edwardes, Michael, *A History of India*, Bombay, 1932.

Elmer, Graper, *American Police Administration*, Newyork, 1969.

Ewart, J. M. Director, *Intelligence Bureau, Terrorism in India, 1917—1936*, Simla, Government of India Press. 1937.

Gourlay, W. R., *A Contribution Towards a History of the Police in Bengal*, Calcutta, 1916.

Gourley, G. Doglas, *Public Relations and the Police*, Illinons, 1953.

Goldstein, A. P and others (ed), *Police and the elderly*, Newyork, 1919.

Dhaka University Institutional Repository

Gupta, A, *Crime and Police in India (upto 1861)*, Agra, 1974.

Gupta, A, *Police in British India (1861—1947)*, New Delhi , 1979.

Hussaini, S. A. Q, *Administration under the Mughals*, Dhaka, 1962.

Jain, M. P., *Outlines of Indian Legal History*, Delhi, 1952.

Kibria, A. B. M. G., *Police Administration in Bangladesh*, Dhaka. 1967.

Kalia, B. R., *A History of the Development of the Police in Punjab 1849—1905*, Punjab, 1929.

Leonard V. A & More, H. W., *Police Organization and Management*, Newyork, 1974.

Majumdar, R. C. Raychandhuri, H. D & Dutta Kalikin, *An Advanced History of India*, London, 1960.

Majumdar, D. N., *Justice and Police in Bengal 1765—1793*, Calcutta, 1960.

Misra, B. B., *The Administrative History of India (1834—1947)*, Bombay, 1970.

Misra, B. B., *The Judicial Administration of the East India Company in Bengal (1765—1782)*, Delhi , 1961.

Misra, B. B., *The Central Administration of the East India Company 1773—1834*, Manchester, 1959.

Mukherjee, Arun, *Crime and Public Disorder in Colonial Bengal (1861—1912)*, Calcutta, 1995.

Muntassir Mamoon & Joyanta Kumar Roy, *Civil Society in Bangladesh — Resilience and Retreat*, Dhaka, 1998.

Nigam, S. R., *Scotlandyard and the Indian Police*, Allahabad, 1963.

Raziv, N. A., *Our Police Heritage*, Lahore, 1961.

Roberge, R. R., *Police Management and Organizational Behaviour*, Newyork, 1979.

Roberge, *The Changing Police Role*, California, 1976.

Shane, Paul. G., *Police and People*, Toronto, 1980.

Sullivan, John. L., *Introduction to Police Science*, London, 1966.

Walker, Samuel, *The Police in America, An Introduction*, Newyork, (year unmentioned)

Wrigh, S. Fowler, *Police and Public*, London, 1927.

Wilson, O. W., *Police Administration*, Newyork, 1950.

Woods, Arther, *Policeman and Public*, Newhaven, 1919.

Dhaka University Institutional Repository

IV. Articles : ইংরেজি ভাষায়

M. Azizul Huq, "Bangladesh Police Its Organizational Pattern and Emerging role in the Society," *Administrative Science Review, Journal of the National Institute of Public Administration*, Vol. IX, No. 3, September, 1979, P. 14

Mohammad Shah, "Terrorism in Colonial Bengal : The Muslim Response," (Paper read at the *Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, on 14 December, 2000).

V. Bengali Books—বাংলা গ্রন্থ

আলী আজগর, ড. মুহম্মদ ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী, ১৯৮৯।

এ. এ. খান, *বাংলাদেশ পুলিশ ঃ নিয়ম-কানুনসমূহ*, ঢাকা, ১৯৮৭।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, অনুবাদক – ডঃ মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৪০৪ বাংলা।

ঘোষাল,পঞ্চানন, *পুলিশ কাহিনী*, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৪।

ঘোষাল,পঞ্চানন, *পুলিশ কাহিনী*, ২য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৫।

চৌধুরী, আহমেদ আমিন, *বাংলাদেশ পুলিশ – উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা, ১৯৯৩।

টেগার্ট, স্যার চার্লস, *ভারতে সন্ত্রাসবাদ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা – নন্দ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৯০ বাংলা।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৭৫।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (বাংলাদেশ সংস্করণ)*, ঢাকা, ১৯৮৪।

রায়, নিহার রঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, ১৯৮০।

হোসেন, শওকত আরা, *বাংলার রাজনীতি ও ব্যবস্থাপক সভা (১৯৩৭—১৯৪৩)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

অন্যান্য ঃ

ঢাকা প্রকাশ (১৯০৫—১৯৪০)
ডিটেকটিভ (১৯৯০—২০০২)।
Calcutta Review, (19th & 20th Century)
Modern Review (20th Century)